দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ।। ২৩ জুন - ২০১৪।।
৮ আষাঢ় - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

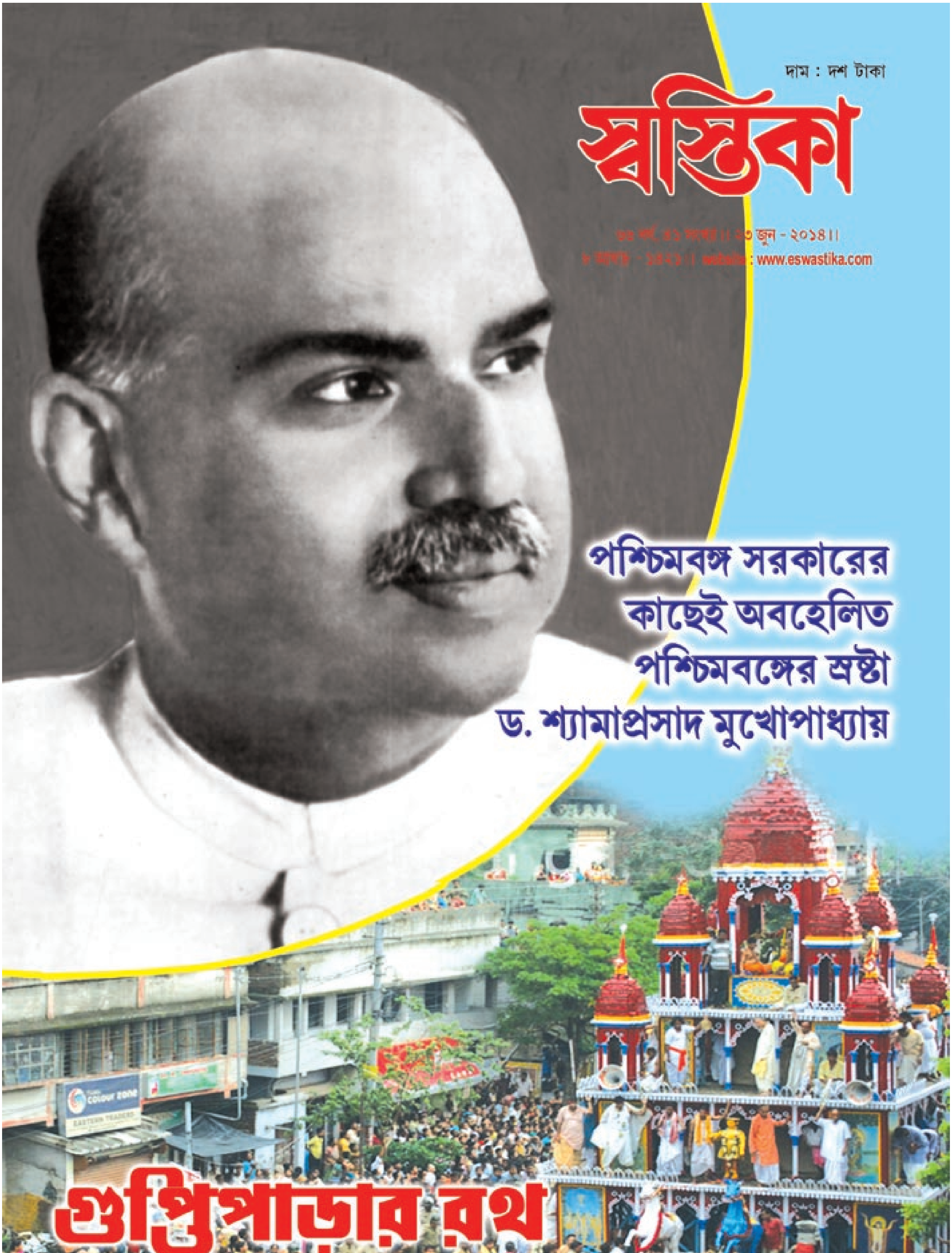

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেই অবহেলিত পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গুপ্তিপাড়ার রথ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ৬-৯
এক ঝাঁক চিত্রতারকা দিয়ে রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয় গূঢ়পুরুষ ১০
খোলা চিঠি : দিদিভাই লাড্ডু খামু সুন্দর মৌলিক ১১
পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপানন্দ ব্রহ্মচারী ১২
লক্ষ্যপূরণে রাজ্যই শেষ কথা বলবে অরবিন্দ পানাগারিয়া ১৪
নতুন দিগন্তে ভারতীয় অর্থনীতি অম্লানকুসুম ঘোষ ১৬
ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ : কেন্দ্রে নতুন সরকারের কার্যকলাপ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী ১৮
গুপ্তিপাড়ার রথ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ২১
সঙ্ঘ এবং ব্যক্তিপূজা মাধব গোবিন্দ বৈদ্য ২৭
চা-শ্রমিকদের করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রিপোর্ট প্রকাশ করছে না শ্রমদপ্তর বাসুদেব পাল ২৯
মাও প্রভাবিত এলাকার মানুষের আশা পূরণে নকশাল দমনে কঠোর পদক্ষেপ মোদী সরকারের ৩১
ভারত এখন এক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে অমলেশ মিশ্র ৩২

বিশেষ বিষয়

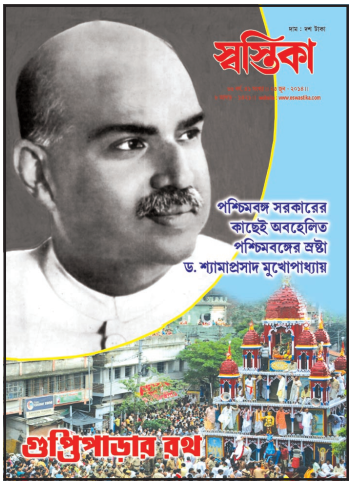

পৃঃ - ১৪-১৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০   নবাঙ্কুর : ২৪-২৫   অঙ্গনা : ২৬
অন্যরকম : ৩৩   সুস্বাস্থ্য : ৩৫   সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮
  রঙ্গম : ৩৯-৪০   শব্দরূপ : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ৮ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৬, ২৩ জুন - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ৩০শে জুন ২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়

প্রকাশিত হবে ৩০শে জুন ২০১৪

ধারা ৩৭০ কি সত্যিই জরুরি?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তাঁর মন্ত্রিসভার একজন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলায় জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শোনা যায় বিচ্ছিন্নতার সুর। জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়— জম্মু-কাশ্মীর কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এই প্রেক্ষাপটেই এবারের বিশেষ বিষয়— ধারা ৩৭০ কি সত্যিই জরুরি? বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, অজয় ভারতী প্রমুখ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ঘরশত্রু বিভীষণ

সম্প্রতি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের 'সেভেন মার্ডারস' এর মূল অভিযুক্ত কুখ্যাত দুষ্কৃতী নূর হোসেনকে গ্রেফতার করিয়াছে বিধাননগর কমিশনারেটের 'অ্যান্টিটেররিজম স্কোয়ার্ড'। ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিস রহিয়াছিল এই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ সরকারও তাহার খোঁজ করিতেছিল। বাংলাদেশের অভিযোগ ছিল এই সন্ত্রাসবাদী পশ্চিমবঙ্গে গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযোগ স্বীকার করে নাই। দাউদ ইব্রাহিম-সহ অন্যান্য সন্ত্রাসী পাকিস্তানে রহিয়াছে বলিয়া শত প্রমাণ হাজির করিলেও পাকিস্তান যেমন তাহা স্বীকার করে না, হাজার জঙ্গি সন্ত্রাসী পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাহা স্বীকার করিবেন না। বাংলাদেশের মৌলবাদী ইসলামি দল জামাতে ইসলামির সহিত তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুবিদিত। এই দেশের নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সহিত তৃণমূলের সম্পর্ক রহিয়াছে। এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় তৃণমূল সদস্যও করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কট্টর পাকিস্তানপন্থী ও ভারত-বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীরা তৃণমূলের প্রশ্রয়ে ও ছত্রছায়ায় পশ্চিমবঙ্গে কার্য করিতেছে তাহা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। সংখ্যালঘু তোষণের নামে সন্ত্রাসীদেরও তোষণ চলিতেছে। আই এস আই, জামাতে ইসলামি এখন তৃণমূলের প্রশ্রয়ে সরাসরি এই রাজ্যে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাইতেছে। তৃণমূলের বোরখা পরিহিত এই সন্ত্রাসবাদীরা হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি, লুঠপাট ও নারীধর্ষণ চালাইতেছে। সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল তৃণমূল সরকারের প্রশাসন তাহাতে মদত দিতেছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে মোদী সরকার আসিবার পর সমস্ত মৌলবাদী ইসলামি সন্ত্রাসবাদী তৃণমূলের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। সংখ্যালঘু ভোট পাইবার জন্য তৃণমূলও দেশের নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া এই সম্পর্ককে মান্যতা দিয়াছে। এই সম্পর্কের বিষময় ফল অচিরেই ফলিবে। আমরা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবার জন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করিয়া থাকি কিন্তু এখন ঘরশত্রু বিভীষণকে কি বলা যাইতে পারে? কেবল ভোটের লোভে মোদী-বিরোধিতার জন্য এই ভাবে দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাইবার নজির পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোয় কেন্দ্রে একটি দলের সরকার থাকিবে আর রাজ্যে সেই দলের সরকার ক্ষমতায় নাও থাকিতে পারে কিন্তু কেন্দ্র বিরোধিতার নামে কেন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য দেশের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কেমন গণতন্ত্র? বস্তুত রাজ্যে বিজেপিকে আটকাইতে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করিবার যে কৌশল লইয়াছে তৃণমূল তাহা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে চরম ক্ষতিকর।

বামফ্রন্ট সরকারের চৌত্রিশ বৎসরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান করিডর। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গ দিয়াই সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, না হয় পলায়ন করিয়াছিল। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলি হইয়া উঠিয়াছে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল। অনুপ্রবেশ, জালনোট, নারী পাচার এই সব অঞ্চল দিয়াই হইয়া থাকে। অনুপ্রবেশের দাপটে রাজ্যের সীমানা ও জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে। সিপিএমও এই সমস্যাকে মদত করিয়াছিল। ক্ষমতায় আসিয়া তৃণমূল এই শক্তিকে শুধু আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় নাই, রাজনৈতিক স্বার্থেও ব্যবহার করিতেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে হাসিনা সরকার জামাতে ইসলামি, আই এস আই-কে দেশছাড়া করিবার উদ্যোগ লইয়াছে। আর তাহাদের কর্মীরা এই রাজ্যে পলাইয়া আসিয়া তৃণমূল নেতাদের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে অশুভ কার্যকলাপ চালাইতেছে।

সুভাষিত

লোকানুগ্রহকর্তারঃ প্রবর্ধন্তে নরেশ্বরাঃ।
লোকানাং সংক্ষয়াচ্চৈব ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ।।
(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ)

যে রাজা তাঁর প্রজাদের মঙ্গল করেন তিনিই সমৃদ্ধিশালী হন এবং যে রাজা প্রজাদের কষ্ট দেন তাঁর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

নওয়াজের ভারত সফরে ক্ষুব্ধ পাক-জঙ্গিদের হিংসার ছক জম্মু-কাশ্মীরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ উপলক্ষে পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সফল দিল্লী সফরের পর থেকেই চক্রান্ত চলছে জম্মু-কাশ্মীরকে অশান্ত করার। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শরিফের দিল্লী সফরের পরই তাঁরা 'আবিষ্কার' করেন যে পাক-সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের যোগাযোগ ক্রমশ বাড়ছে। আর এই যোগসাজশেই সন্ত্রাস-কবলিত কুপওয়ারা জেলার কিরান ও মাচিল এলাকায় অশান্তি ছড়াচ্ছে। এই অশান্তির জেরে সামগ্রিকভাবে জম্মু-কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি হচ্ছে। গত ৭ জুন কেন্দ্রীয় কাশ্মীর দেবস্থানে এক পুলিশকর্মীকে গুলি করে কয়েকজন অজ্ঞাত-পরিচয় জঙ্গি তিনটি রাইফেল কেড়ে পালিয়ে যায়। ওই দিনই অন্য একটি ঘটনায় দক্ষিণ-কাশ্মীরের সোফিয়ান শহরে একটি পুলিশ-পার্টিতে প্রকাশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঘটনায় দুই সাধারণ নাগরিক-সহ চার পুলিশ-কর্মী আহত হন।

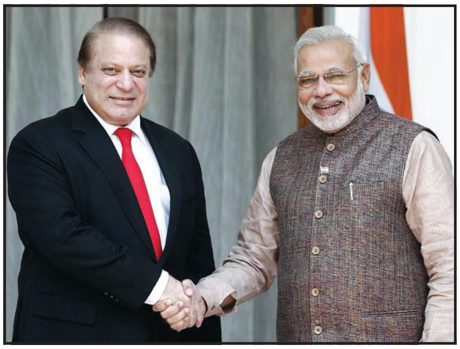

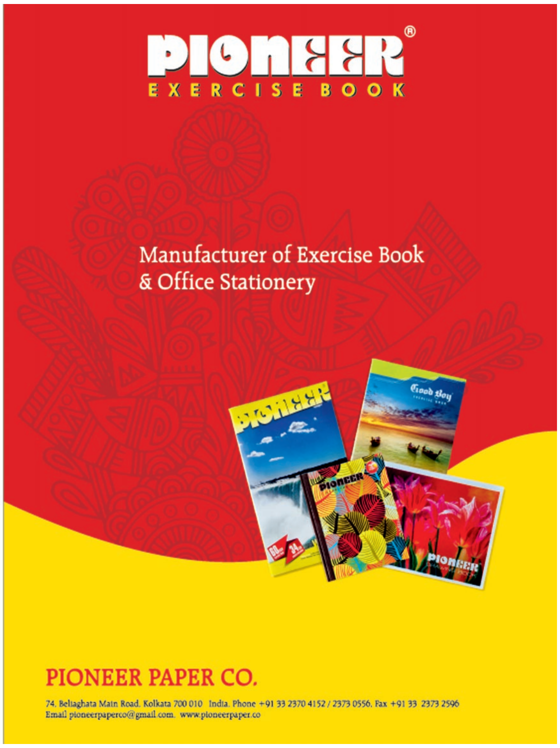

তথ্যাভিজ্ঞ মহল সূত্রে খবর, নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে নওয়াজ শরিফের দিল্লী সফরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ পাক-জঙ্গি সংগঠনগুলি। দিল্লীর মসনদে নরেন্দ্র মোদীর বসার সম্ভাবনা অতি প্রবল আঁচ করেই ভোটের ফল প্রকাশের অব্যবহিত আগেই নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করায় তারা। জুনের গোড়ায় লস্কর-এ-তৈবা প্রধান হাফিজ সঈদ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বেশ কিছু জঙ্গি শিবির পরিদর্শন করে। এরপরই দেখা যায় তেহরিক-ই-তালিবান মুজাহিদ নামক জঙ্গি সংগঠনটি পুঞ্চ সেক্টরে অস্ত্র সংগ্রহের কাজে নেমেছে। এই জঙ্গি সংগঠনটির অস্তিত্ব রয়েছে গোটা পাকিস্তান জুড়েই। সব মিলিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা তথা দেশের নিরাপত্তা গভীর সঙ্কটের বলয়ে।

তবে দেশের নিরাপত্তাবাহিনীও যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে। গত ১০ মে পুঞ্চ সেক্টরে একপ্রস্থ গুলির লড়াইয়ের পর পাক-অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে একে সিরিজের রাইফেল উদ্ধারে সমর্থ হয় তারা। জম্মু ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণরেখা সমেত বাগাইল ধারার নিকটবর্তী এলাকায় গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ান প্রেম বাহাদুর রোকা মাগার হাতে হাতে লড়াইয়ে অনুপ্রবেশকারীদের হারিয়ে তাদের সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেন। সূত্রের খবর, ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতির গন্ধ পেয়েই হিংসার পরিকল্পনা নিয়েছে পাক-জঙ্গি সংগঠনগুলি। যার পেছনে আই এস আই-এর সক্রিয় সমর্থনের ইন্ধন থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অনুপ্রবেশজনিত কারণে রাজ্যে যদিও এখনও বড় ধরনের কোনও হিংসার খবর নেই। তবুও অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য যে পথগুলি শীতে তুষারাবৃত থাকে এখন তা খুলে যাওয়ায় সেনাবাহিনী নিয়মিত আক্রমণাত্মক টহলদারি শুরু করেছে সেখানে।

এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর সরকারও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। গত ৬ জুন রাজধানীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে ভু-স্বর্গের পরিস্থিতি বিশদে ব্যাখ্যা করেন সেনাপ্রধান বিক্রম সিং। নয়া দিল্লীর ওয়্যার রুমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি-কে এ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা জুনের মাঝামাঝি দেওয়া হবে বলে সেনাসূত্রে জানানো হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারতে পাকিস্তান ও চীনের সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর আলোচনার কথা গত ৩ জুন থাকলেও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গোপীনাথ মুণ্ডের দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুতে তা স্থগিত হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি এই বৈঠক শুরু হবে বলে সূত্রের খবর।■

ভারতে পালাবদল বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ভারতে রাজনৈতিক পালাবদল বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এবং সিংহভাগ রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদীকে সাম্প্রদায়িক চিত্রিত করার চেষ্টা ছিল ব্যাপকভাবে, কিন্তু ১৬ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরই চিত্র পাল্টে যায়। এই গণমাধ্যমই এখন বলছে, ভারতে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। জনগণ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী পথচলার শুরুতেই সার্কদেশের সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মৈত্রীর যে বার্তা দিয়েছেন তা এ অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে ভারত যে এ অঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর এবং বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, তারও জানান দিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। রাজনীতিকদের অনেকেই বলেছেন, ভারতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে মোদী শাসনে। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ সংবাদপত্রে লিখছেন এবং টেলিভিশনে টক-শোতে বলছেন, মোদীর জয়ের আরেকটা দিক হচ্ছে, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ রায় দিয়েছে। বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়বে। লেখালেখি এবং আলোচনায় মোদীর 'সাম্প্রদায়িক চিত্র' এখন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

এর কারণও আছে। নরেন্দ্র মোদী সম্ভবত গত তিন দশকের মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেন। গত কয়েক জমানার মতো শরিক-নির্ভর দুর্বল সরকার নয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পড়শি সার্ক দেশগুলোর সরকার প্রধানদের দিল্লীতে এনে মৈত্রীর বার্তা দিলেন। সংঘাত নয়, উন্নয়নে হাত মেলাতে চাই। তবে মাথা নত করে নয়। মোদী গুজরাটে পরিবর্তন এনেছেন, অঙ্গীকার এবার গোটা ভারতের চেহারা পাল্টে দেবেন। সব কিছু মিলিয়ে এবার ভারত-নেতার অন্য চেহারা। বাংলাদেশ থেকে সরকার ও বিরোধী দল অনেকটা প্রতিযোগিতা করে মোদীকে অভিনন্দন জানালেন। সবার আগে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানো হলো। এমনটি বাংলাদেশে এর আগে সেভাবে ঘটেনি। লেখালেখিতে বলা শুরু হলো, কংগ্রেসের চাইতে অকংগ্রেসী সরকারের আমলেই বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে বেশি পেয়েছে। ত্রিশ বছরের গঙ্গা চুক্তি সই, সরাসরি ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল সবচাইতে বড় উদাহরণ। কেউ কেউ একথাও বলছেন, তিস্তার জলের হিস্যা মোদীর আমলেই পাওয়া যাবে, সমাধান হবে সীমান্ত সমস্যারও। বাড়বে ব্যবসা-বাণিজ্য, যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসবেন দু'দেশের উদ্যোক্তা- শিল্পপতিরা। এমন লেখালেখি বা আলোচনা আগে লক্ষ্য করা যায়নি। ট্রানজিটের কথা উচ্চারণ করলেই যেখানে হৈহৈ করে দেশ গেল দেশ গেল চিৎকার উঠতো, সে অবস্থা এখন মনে হচ্ছে পাল্টে যাচ্ছে। এক সময়ের কট্টর ভারত-বিরোধী দল বিএনপি'র তাত্ত্বিকরাই এখন বলছেন, দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ট্রানজিটে আপত্তি নেই। এর আগে ভারতের কোনো নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের এতোটা মাতামাতি হয়নি। সম্ভবত গণমাধ্যমের এতো প্রতিনিধিও নির্বাচনের খবর পাঠাতে ভারত যাননি। কারণ আর কিছু নয়, মোদী নির্বাচনের ময়দানকে স্রেফ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেন। আর এবারে নির্বাচন যেন শুরু থেকেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছিল, যে পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

এক কলামিস্ট লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, মোদীকে হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে পুরে দেবেন। তার উত্তরে মোদী বললেন, হাতকড়া পরাতে হবে না, কোন কারাগারে পুরবেন বলুন, আমি নিজেই হাজির হয়ে যাবো। এর মাধ্যমেই মমতা প্রমাণ করলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী। আর মোদী ভারতের।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যেভাবে ফলাও প্রচার পেয়েছে, এর আগে কোনো নির্বাচনে এমন ঘটেনি। এখন মোদী কীভাবে এগুচ্ছেন তারই খবর ফলাও করে। সংবাদপত্রের বিদেশ পাতায় সিংহভাগ জুড়ে ভারতের খবর। কলামিস্টরা আগে যেভাবে কথায় কথায় আহমেদাবাদের খবর টেনে আনতেন, বিজেপি নিয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা তুলে ধরতেন, এখন সেই আবহ নেই। কী এক জাদুমন্ত্র যেন কাজ করছে। আর এই জাদুমন্ত্রে ভারত-বিদ্বেষের রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

নেত্রদান মহাদান

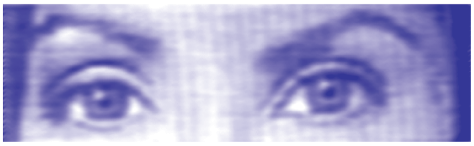

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

সীমান্তে চীনা শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক করলো এস এস বি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সংলগ্ন নেপাল সীমান্তে চীনা শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক করল সশস্ত্র সীমা বল (এস এস বি)। ওই দুই রাজ্যে ৫৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ স্পর্শকাতর ভারত-নেপাল সীমান্ত বরাবর চাইনিজ লার্নিং সেন্টার বা সি এল সি-র সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে বলে সূত্রের খবর। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাই নেপালের সীমান্ত গ্রামগুলির স্কুলগুলি পরিচালিত হচ্ছে। এস এস বি-র আশঙ্কা এই যে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র সি এল সি-গুলো গজিয়ে উঠছে— এগুলো নেপালে চীনের অধীনে সড়ক, রেলপথ এবং বিমানবন্দর তৈরিতে যে সমস্ত বড়ো প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে তাতে কর্মসংস্থান যোগাচ্ছে। ভারতের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ যা চীনের বৃহত্তর পরিকল্পনার এগুলি অঙ্গ হতে পারে বলে সশস্ত্র সীমা বলের আধিকারিকেরা মনে করছেন।

সূত্রের খবর, গত তিন-চার বছরে ওই অঞ্চলে চীনা শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমান্ত সংলগ্ন উত্তর-প্রদেশের দিক বরাবর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এফ এম চ্যালেনগুলিতে সম্প্রতি ভারত-বিরোধী আলোচনাচক্রের যে নতুন প্রবণতা দেখা গিয়েছে, তাতে চীনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওই ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সূত্রের আরও খবর, সি এল সি যে সীমান্ত জেলাগুলিকে তাদের লক্ষ্যবস্তু করেছে তার মধ্যে রয়েছে কাঞ্চিপুরু, কাইলালো, বরদিয়া, বাঙ্কি, ডাঙ্গু ও কপিলাবস্তু। এছাড়া নেপাল ভূখণ্ড তো তাদের 'টার্গেটে'র মধ্যে রয়েছেই।

একটি ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এস এস বি-র আই জি পি অবিনাশ চন্দ্র বলেছেন : 'আমরা সীমান্ত অঞ্চলে সি এল সি-র সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে সম্ভাব্য চীনা পরিকল্পনা ও অসদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করেছি। যদিও ঠিক কতগুলি চীনা শিক্ষাকেন্দ্র এই মুহূর্তে সীমান্ত অঞ্চলে ভারত-বিরোধিতায় কাজ করছে তার সংখ্যাটা তিনি বলতে চাননি। শ্রী চন্দ্রের বক্তব্য গত কয়েক বছরে সীমান্ত থামগুলি উপড়ে ফেলা হয়েছে।

এবিষয়ে এস এস বি পাল্টা কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তার জবাবে অবিনাশ বলেন : 'সীমান্ত সুরক্ষা বল তার সীমান্ত আউট পোস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৭৬টি করেছে এবং জওয়ান সংখ্যাও বাড়িয়েছে। নজরদারির জন্য নতুন সফটওয়্যারও ব্যবহার করা হচ্ছে।'

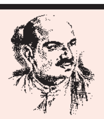

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা যতদিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ-এরই বর্তমান রূপ ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিবর্তনের রূপরেখা এই সংখ্যার স্বস্তিকায় তুলে ধরা হবে। এরই পাশাপাশি থাকছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলির পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টাকে নিয়ে উদাসীনতা— এককথায় যা লজ্জাজনক। লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রকাশিত হবে ৭ জুলাই ২০১৪।। দাম দশ টাকা।।

সত্বর কপি বুক করুন।।

বিদেশে নয়, ভারতেই তৈরি হবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের নৌবহরে নতুন সংযোজন রণতরী আই এন এস বিক্রমাদিত্য সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতেই তৈরি হবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম। আর সেই

বিক্রমাদিত্য-র ডেকে নৌসেনাদের সঙ্গে মোদী।

সমস্ত অস্ত্র ভারত থেকেই বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হবে। এর ফলে আমরা ছোট ছোট দেশগুলিকে রক্ষার পাশাপাশি নিজেদেরও রক্ষা করতে পারব। এতে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হবে, তেমনই তার পাশাপাশি নিরাপত্তাবলয়ও সুদৃঢ় হবে। তিনি আরও বলেন, আগে থেকেই এই পরিকাঠামো আয়ত্তে ছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে সামরিক সম্ভার এখন ভারতীয়করণ করে তুলে দেওয়া হবে। তবে এটা যাতে কথার কথা না হয়ে থাকে, সেটাও লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১৬০০ নাবিকের সামনে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে বলেন, "আমরা কাউকে চোখ রাঙাবো না, কিন্তু চোখ নিচু করেও চলব না, দুনিয়ার চোখে চোখ রেখে চলব।"

পরলোকে
ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥
স্বস্তিকার পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয় লেখক শিবাজী গুপ্ত আর নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ যিনি 'শিবাজী গুপ্ত' ছদ্মনামে দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে স্বস্তিকায় লিখে চলেছেন, গত ১৬ জুন, সোমবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক দীনেশবাবু অকৃতদার ছিলেন। এই দিন তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দ, স্বস্তিকা, কৃশানু পত্রিকা, নোয়াখালি সম্মিলনী, বাটানগর নিউল্যান্ড সম্মিলনী, দৌলতপুর সমন্বয়ী ক্লাব প্রভৃতি সংস্থা।

বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার সিন্দুরকাঠি-বাবুপুর গ্রামে ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গা ও দেশভাগের বলি হিসাবে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং দক্ষিণ ২৪-পরগণার করনজুলি এলাকায় বসবাস শুরু করেন। দারিদ্রের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাস নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকরিতে যোগ দেন এবং ১৯৯৫-এ ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি তাঁর পড়াশোনা ও গবেষণার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন এবং বাংলাদেশের কবিগান ও পরম্পরা বিষয়ের উপর গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি শ্রী আশুতোষ গোল্ড মেডেল, গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ ও সরোজিনী বসু গোল্ড মেডেল পান।

দীনেশবাবু একাধিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শ্যামাপ্রসাদ ও বঙ্গবিভাগ', 'নোয়াখালির মাটি ও মানুষ', গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ও তাঁর রচিত 'প্রসঙ্গ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'আশুতোষের শিক্ষা চিন্তা'-সহ মোট ৮টি গ্রন্থ প্রকাশ করে।

'স্বস্তিকা' পত্রিকায় শিবাজী গুপ্ত ছদ্মনামে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি লিখেছেন। সেইসব লেখায় একদিকে যেমন দুর্জনদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, অন্যদিকে তেমন হতবাক দেশবাসীর ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে সেই প্রকাশে বিক্ষোভ থাকলেও বিদ্বেষ ছিল না। গুরুগম্ভীর বিষয়গুলি অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু ও লবণ— এই ছয়রসে রসায়িত করে পরিবেশন করেছেন— যা হৃদয়ে আঘাত করে, কিন্তু রক্তক্ষরণ ঘটায় না। 'স্বস্তিকা'-র শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি স্বস্তিকা পাঠকদের প্রথম পাঠ্য হিসেবে গণ্য হতে থাকে। তাঁর এই রচনাগুলি নিয়ে 'শিবাজী গুপ্ত'র কলমে' নামে দুই খণ্ডে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে স্বস্তিকায় শ্রীচৈতন্য বর্ধন নামে তিনি লিখেছেন। স্বস্তিকায় তাঁর শেষ রচনা 'ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্তি' প্রকাশিত হয় ২ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়।

এছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। গত প্রায় ৪৫ বছর ধরে 'কৃশানু' নামে সাহিত্য পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষাজগৎ ও ঘনিষ্ঠমহল গভীরভাবে শোকাহত। তাঁকে হারিয়ে 'স্বস্তিকা' শুধু একজন লেখককে হারালো নয়, একজন পরমাত্মীয়কেও হারাল। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর অমর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

এক ঝাঁক চিত্রতারকা দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়

গূঢ়পুরুষের কলম

গত লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি-র নজিরবিহীন সাফল্যতে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। তবে এটাই সাফল্যের শেষ কথা নয়। মনে রাখতে হবে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলি আজও বিজেপি বিরোধীদের হাতে রয়েছে। বিজেপির হাতে আছে দেশের পাঁচটি রাজ্য। এই পাঁচটি রাজ্য হচ্ছে, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও গোয়া। এছাড়া এনডিএ জোট শরিকদের নিয়ে অন্য দুটি রাজ্য, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। অর্থাৎ মোট সাতটি রাজ্যে বিজেপি শাসকদল। অথবা শাসকদলের জোট সঙ্গী। যেমন, পাঞ্জাবে অকালি দল এবং অন্ধ্রে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম। এই সাতটি রাজ্য ছাড়া দেশের অন্য রাজ্যে অ-বিজেপি রাজ্য সরকারগুলি সর্বদাই চেষ্টা চালাবে কেন্দ্রে মোদী সরকারকে নানাভাবে বিব্রত করার। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মনে করছে বামপন্থী বা সিপিএম তাদের এখন প্রধান রাজনৈতিক শত্রু নয়। প্রধান শত্রু বিজেপি। লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিতর্কে যোগ দিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে ব্যক্তি কুৎসায় নেমেছিলেন তাতে একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে প্রয়োজনে বিজেপি-র বিরুদ্ধে অতি নিম্নরুচির আক্রমণে যেতে তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিধাবোধ করবে না। রাজ্যের জেলায় জেলায় বিজেপি-র সমর্থকদের উপর যে সশস্ত্র হামলা চলছে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এবং আর এস এস স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘকাল পড়ে পড়ে মার খাবেন না। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে হামলা চালানোর নীতি ব্যর্থ হবেই। ধীরে ধীরে রাজ্যজুড়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। বিজ্ঞানের একটি সূত্র বলে যে প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। সিপিএম এবং তার শরিকদল সিপিআই, আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য থেকে কার্যত উঠে গেছে। দুর্বল, নেতৃত্বহীন বামদলগুলির কর্মী সমর্থকরা বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বিপন্ন বামকর্মী সমর্থকরা আত্মরক্ষার তাগিদে দলে দলে বিজেপি-র পতাকার তলায় আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজেপি-র রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে যুক্তভাবে এইসব বিপন্ন মানুষজনকে রক্ষা করতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এই রাজ্যে ৬১ শতাংশ ভোটদাতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোট বিভাজনের ফলে তৃণমূল-বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাদের মতামত প্রভাব ফেলতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হবে ২০১৬ সালে। হাতে এখনও দু' বছর সময় আছে। মমতা বাম নেতাদের যতই ফিশফ্রাই খাওয়ান না কেন সিপিএমের অতি বৃদ্ধনেতাদের আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কলকাতা কেন্দ্রিক বাম নেতৃত্ব জেলার কর্মী সমর্থকদের সমস্যাটা বোঝেন না। অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে বোঝার শক্তি নেই। বিপন্ন বাম সমর্থকদের উপর জেলায় জেলায় তৃণমূলের হামলাবাজি চললেও বুদ্ধ-বিমানরা আলিমুদ্দিনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে জেলা সফরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। তাই তাঁরা নবান্নে গিয়ে দিদির কাছে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন। দলের বৃদ্ধ নেতাদের এমন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার কাণ্ড কারখানা দেখে বাম কর্মী-সমর্থকরা হতাশ। তাঁরা বুঝেছেন, একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর সরকারই তাঁদের বাঁচাতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় রকম রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়েছে। এই মেরুকরণকে ঠিকমতো পরিচালিত করতে পারলে আগামী বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র রাজনৈতিক জমি নিঃসন্দেহে এখন সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতোই বিজেপি-র পক্ষে হাওয়া রয়েছে উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড ও দিল্লীতে। দিল্লীর সাতটি লোকসভা আসনই এবার জিতেছে বিজেপি। চলতি বছরের শেষদিকে বিধানসভার ভোট হওয়ার কথা আছে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে। এই দুটি রাজ্যে বিজেপি-র প্রতি সমর্থন বেড়েছে। পরের বছর ২০১৬ সালে ভোট হবে বিহার এবং জম্মু-কাশ্মীরে। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিহার রাজ্যে বিজেপি যথেষ্ট ভাল অবস্থায় আছে। জনমতের এই সমর্থনকে ধরে রাখতে পারলে উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, দিল্লী, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও বিহার 'কমল পতাকার' দখলে আসছে তা বলে দেওয়া যায়। এখন সাতটি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি-র এনডিএ জোট। ২০১৫ সালের মধ্যে আরও ছয়টি রাজ্য যুক্ত হলে মোদী সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণ করাটা মসৃণভাবে সম্পন্ন করা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষকে ভাবতে হবে তাঁর কী চান। পিছিয়ে পড়তে অথবা এগিয়ে যেতে। বাংলার মানুষকে বুঝতে হবে যে বাস্তব জীবনটা সিনেমা নয়। এক ঝাঁক চিত্রতারকা দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়। লোকসভার নির্বাচনে বিপুল ভোটে হেরেছেন বলেই দুই তৃণমূল প্রার্থীকে 'বঙ্গভূষণ' সম্মান দিতে হবে এটাই যদি উন্নয়নের রাজনীতি হয় তবে মানুষকে সেই সস্তার পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করতেই হবে। আমার স্থির বিশ্বাস ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বাংলার মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন।

দিদিভাই লাড্ডু খামু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, নরেন্দ্র মোদী লাড্ডু হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি এনে না দিন না প্লিজ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কলকাতায় জনসভা করতে এসে ব্রিগেড ময়দানে লোভ দেখিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তখন তিনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। আর এখন তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং সত্যি সত্যিই এখন বঙ্গবাসীর হাতে জোড়া লাড্ডু পাওয়ার কথা। এবারের লোকসভা নির্বাচন সত্যি সত্যিই রাজ্যের রাজনৈতিক ছবির অনেক বদল এনে দিয়েছে। বিজেপি গোটা রাজ্যে নিজেদের ভোট এক লাফে অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। বহু আসনেই দেখা গেছে দ্বিতীয় স্থানে পদ্মবাহিনী। এমনকী খোদ কলকাতাতেও। বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে তারা এক নম্বরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কেন্দ্র ভবানীপুরেও! আপাতত মোদী হাওয়া বামেদের বেশি ভোট কাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেও পদ্মের বাড়বাড়ন্ত ঘাসফুলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলার রাজ্য রাজনীতি এখন এই মহা জটিলতার আবর্তে দাঁড়িয়ে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিজেপিই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিদিন শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে বিজেপি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষুব্ধ সদস্য, সমর্থকদের মধ্যে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। এমনকী সমাজের বিশিষ্টজনদের একাংশ শাসক দলের চেয়ে বিজেপি-র মধ্যে ভবিষ্যৎ বেশি মনে করে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন। অনেকে আবার এখন থেকেই পদ্মের মধ্যে ঘাসফুলের চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠার লক্ষণও দেখতে পাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে নির্বাচনের আগে বঙ্গবাসীর দু'হাতে লাড্ডু পাওয়ার যে লোভ দেখিয়েছিলেন তা কী আদৌ পূরণ হবে? কথায় আছে দিল্লীর লাড্ডু খেলেও পস্তাতে হয়, না খেলেও পস্তাতে হয়। তবে তো খেয়ে পস্তানোই ভাল।

নরেন্দ্র মোদী অবশ্য ইতিমধ্যেই একাধিকবার বলেছেন নির্বাচনের আগের লড়াই এখন আর তিনি মনে রাখতে চান না। আর দেশের কাজের জন্য সব রাজ্য, সব রাজনৈতিক দলের সাহায্য তাঁর দরকার। এমনকী সংসদের প্রথমে ভাষণে তিনি সরাসরি দিদি আপনার নাম উল্লেখ করে লড়াইকে সম্মান জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর আচরণে সহযোগিতার ভাবই দেখা যাচ্ছে।

ফল ঘোষণার পর থেকে এই চিঠি লেখা পর্যন্ত কেন্দ্রের সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে খারাপ, ভাল কোনও কথাই বলেননি। কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের পর একে একে অকংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে এসেছেন। অনেকে দাবি দাওয়াও পেশ করেছেন। এমনিতে লোকসভায় কোনও দলেরই সহযোগিতা দরকার নেই মোদী সরকারের। দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে নিরঙ্কুশ পাঁচ বছর সময় দিয়েছে। তবে আগামী বছর দেড়েক রাজ্যসভায় কয়েকটি দলের সমর্থন তাঁর দরকার। তবে সেইজন্য প্রয়োজনীয় অঙ্ক পেয়ে যাওয়ার রাস্তাও খোলা আছে। সেটা খুব একটা অসুবিধার হবে না বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পক্ষে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে কিংবা রাজ্য সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনি তো ননই, আপনার দলের জয়ী ৩৪ সাংসদের একজনও মোদীকে শুভেচ্ছা জানাননি। খারাপও কিছু বলেননি। অনেকে বলছেন, নির্বাচনের আগে যে পর্যায়ে মোদীকে গালমন্দ করেছেন তার পর সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আপনি লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু অনেক রাজ্যেই তো প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে মোদী তথা বিজেপির সংঘাত হয়েছে। তবে তাঁরা তা ভুলতে পারলে মমতা কেন পারবেন না?

কিন্তু দিদি টাকা কি নেবেন? সাহায্য কি নেবেন? দু'বছর পর ২০১৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি-র কাছে এই প্রথমবার রাজ্য বিধানসভায় নিজেদের শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রে নিজেদের সরকার থাকায় বিজেপি নেতৃত্ব আরও বেশি করে আশাবাদী। তাই কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের প্রাপ্তি ঘটলে তা বিজেপি-র কাছে হবে প্রচারের বাড়তি অস্ত্র। উল্টো দিকে আপনার অবস্থা এক্ষেত্রে শাঁখের করাতের মতো। যদি দিল্লী দাবি পূরণ না করে তবে উন্নয়ন দূরে থাক রাজ্য পরিচালনাই সম্ভব নয়। কিন্তু কেন্দ্রের সাহায্য যদি বিজেপি-কে প্রচারে সাহায্য করে তবে তো আবার রাজনৈতিক লোকসান। ক্ষমতায় থাকার পাঁচ বছর পর প্রচারে আর বামফ্রন্টের ৩৫ বছরের ব্যর্থতার কথা বলা যাবে না। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই রায় দিয়ে দিয়েছে জনগণ।

দিদি যদি আমার পরামর্শ নেন তবে বলি দিল্লীর কাছে নত হন। তাতে রাজ্যের লাভ হবে। রাজনৈতিক লাভও হবে। এমনিতে আপনার ভাইদের নিয়ে অনেক মুশকিল। দলের কথা অনেক ভেবেছেন। এবার না হয়, আপনার স্লোগানের মা-মাটি-মানুষের কথা একটু ভাবুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

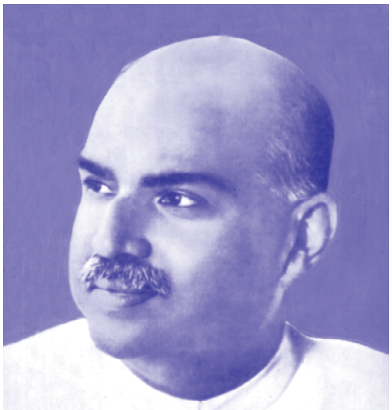

পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ধারা অনুসারে ১৯৩৭ সালে বাংলা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭-এ বৃটিশ ক্ষমতা প্রত্যাহারের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করে পাকিস্তান এবং ভারত দুই ডোমিনিয়ন গঠনের সময় পর্যন্ত বাংলায় এই অবস্থা বজায় ছিল। বাংলার পূর্ব ভাগ যেখানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিল তা পূর্ব পাকিস্তান (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম ভাগ পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে ভারতে থেকে যায়। বাস্তবে বাংলার বিভাজন, সীমানা নির্ধারণের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং ক্রমাগত অ-মুসলমান, প্রধানত হিন্দু উদ্বাস্তুদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগমন ইত্যাদি সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গী হয়। কিন্তু ক্রমাগত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক গভীর সমস্যা রূপে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৭-এর পর ইতিমধ্যেই ঘনজনবসতি সম্পন্ন রাজ্যে দশ লক্ষের বেশি উদ্বাস্তুর আগমন এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে বাংলার প্রশাসনকে হিমসিম খেতে হয়।

১৯৫০-এ দেশীয় রাজ্য কোচবিহার আইন পাশ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ভাষা এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে এই রাজ্য নবরূপে পুনর্গঠিত হয়। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গ ৩,১৪০ বর্গমাইল (৮,১৩০ বর্গ কিলোমিটার) জায়গা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গকে কিছু অতিরিক্ত ভূমি প্রদান করা হয় যার দ্বারা পূর্বেই বিভক্ত এই রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এরূপ একটি সোজা-সাপটা অপ্রতুল বর্ণনা প্রকৃত সত্যের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। অবিভক্ত বাংলা এবং প্রাক্ বিভাজিত ভারতে মুসলিম লীগ বাংলা এবং পাঞ্জাবের একটা বিরাট অংশ কব্জা করতে চাইছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে। হিন্দুদের তাজা রক্তে হাত রাঙিয়ে পাকিস্তানের সবুজ ইসলামিক নকশা তৈরির মাধ্যমে তারা তাদের মতলব হাসিল করতে চাইছিল।

সেই পরিস্থিতিতে বাংলার পশ্চিম অংশকে বাঁচাতে এবং বাঙালি হিন্দুর জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরির জন্য, গঙ্গার পূর্ব তীরে বাংলায় এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। তিনি ভারতের অখণ্ডতার জ্বলন্ত দিশারি ছিলেন। তৎসত্ত্বেও যখন তিনি দেখলেন যে ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান সৃষ্টি অনিবার্য, তখন সমমনস্ক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাবি করলেন ভারত বিভাজনের মতো বাংলা বিভাজনও যেন সমনীতির ভিত্তিতে হয়। সেইজন্য বাংলার একটা অংশ যার বর্তমান নাম 'পশ্চিমবঙ্গ', দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং মুসলিম লীগের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে তা ভারতীয় ইউনিয়নে থেকে গিয়েছিল। সেই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি উদারবাদী এবং মুক্তমনা বাঙালি তথা বাঙালি হিন্দুর পরিত্রাতা এবং প্রকৃত অর্থে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বৃটিশ শাসক দ্বারা প্রথম বঙ্গ বিভাজন কার্যকরী করা হয়েছিল পূর্ব এবং পশ্চিমবাংলা নামে দুটি প্রদেশ রূপে। বাংলা প্রদেশ দ্বি-বিভাজিত হয়ে পশ্চিমভাগ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পূর্বভাগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল রূপে সৃষ্টি হয়। ১৯০৫-এর এই বিভাজন পূর্ববাংলায় বিপুল পরিমাণ হিন্দু সংখ্যালঘু এবং পশ্চিমবঙ্গ যেখানে বেশ কিছু মুসলমান সংখ্যালঘু মানুষকে থেকে যেতে বাধ্য করে। বিভাজনে বিশ্বাসী মুসলমানরা তাদের নিজস্ব প্রদেশ লাভ করে কিন্তু হিন্দুরা তা পায় না। এই মতবিরোধ হিংসা এবং প্রতিবাদের পথে ঠেলে দেয় এবং শেষপর্যন্ত অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাবল্যে ১৯১১ সালে দুটি প্রদেশ পুনরায় একত্রিত হয়।

হিন্দু-মুসলমানের যে চিরন্তন মতবিরোধকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ শাসক ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা করেছিল, সেটি এবং বিভাজন সংক্রান্ত আইন-কানুন ১৯৪৭ পর্যন্ত জারি ছিল বিবদমান পক্ষগুলির রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ করার জন্য।

ফলস্বরূপ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই তত্ত্ব অনুসারেই ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভাজিত হয় এবং বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনা রচনা করেন, যার মাধ্যমে একটি স্বাধীন বাংলা রাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়, যেটি অবিভাজ্য রূপে পাকিস্তান অথবা ভারত কারোর সঙ্গেই থাকবে না। সোহরাবর্দী অনুধাবন করেছিলেন, যদি বাংলা ভাগ হয় তাহলে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে তা অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে আসবে। অর্থাৎ সমস্ত কয়লা খনি, চটকল-সহ অন্যান্য শিল্প কলকারখানা পশ্চিম ভাগে থেকে যাবে যে এলাকা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। সব থেকে বড় কথা হলো তৎকালীন বৃহত্তম শহর কলকাতা, শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং বৃহত্তম বন্দর যা এই পশ্চিম অংশেই থেকে যাবে।

সোহরাবর্দী ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা সবিস্তারে ব্যক্ত করেন।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এক পৃথক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির জন্য মুসলিম হোমল্যান্ড তৈরির উদ্দেশ্য বৃটিশ শাসনকালে তৈরি রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সঙ্গে সোহরাবর্দীর উপরোক্ত পরিকল্পনার বিষয়ে একপ্রকার সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রাথমিক ভাবে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদিকে বর্ধমান লীগের নেতা আবুল হাসিম এটি সমর্থন করেন, অপরদিকে নুরুল আমিন এবং মহম্মদ আক্রাম খান প্রাথমিকভাবে এর বিরোধিতা করেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ কিন্তু সোহরাবর্দীর যুক্তি অনুধাবন করেছিলেন এবং এই প্রস্তাবে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। জিন্নাহর অনুমোদনের পর সোহরাবর্দী তার প্রস্তাবের সপক্ষে লোক জোগাড় করতে থাকেন। অপরদিকে কংগ্রেসের তরফে হাতেগোনা কয়েকজন নেতা এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। তাদের মধ্যে বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা শরৎ চন্দ্র বসু অর্থাৎ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দাদা এবং কিরণ শঙ্কর রায় ছিলেন উল্লেখযোগ্য। যদিও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ নেতা এবং নেহরু ও প্যাটেল-সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব এটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 'হিন্দু মহাসভা' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এটির তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে এই পরিকল্পনাটি সোহরাবর্দীর একটা চক্রান্ত তথা বঙ্গপ্রেমের নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়, যা দিয়ে ভাগাভাগি না করে কলকাতা শহর-সহ শিল্পোন্নত পশ্চিম অংশকে মুসলিম শাসনের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তারা যুক্তি দেখায়, এই পরিকল্পনা দ্বারা একটি সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং বাস্তবে এটি একটি আদর্শ পাকিস্তান হবে যেখানে চিরকালের জন্য সংখ্যালঘু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দয়ায় বেঁচে থাকবে।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন লাভ করা সম্ভব নয় জেনেও শরৎ বসু এবং সোহরাবর্দী আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন যতক্ষণ না এটি প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোয় চুক্তির আকার নেয়। সোহরাবর্দীর মতো বসুও ভেবেছিলেন যে, এই বিভাজন বাংলার অর্থনীতিকে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং প্রায় অর্ধেক হিন্দু জনগণ পাকিস্তানি সীমার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাতে হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না। যদিও এটি একটি বৃহদাকার রাজনৈতিক চুক্তি, তবুও এই প্রস্তাব তৃণমূলস্তরের বিশেষত হিন্দুদের তরফে কোনো সমর্থন লাভ করেনি। সেই সময় মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচার চালাতে থাকে ও পূর্বের ছয় বছরে সোহরাবর্দীর মন্ত্রিসভায় হিন্দুদের সংখ্যা কমানোর বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ভয়ঙ্কর দাঙ্গার বিষয়ে বহু হিন্দু বিশ্বাস করতেন যে, এই ঘটনাগুলি রাষ্ট্রীয় মদতে ঘটেছে, তাই বাঙালি হিন্দুরা মুসলিম লীগ বা সোহরাবর্দী কারুর প্রতিই আস্থাশীল ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই পৃথক তথা যুগ্ম ভোটের প্রশ্নে বসু এবং সোহারাবর্দীর মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। সোহরাবর্দী মুসলমান এবং অমুসলমানদের ক্ষেত্রে পৃথক ভোটাভুটির জন্য জোর করতে থাকেন। শরৎ বসু এর বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন না থাকায় তিনি (শরৎ বসু) সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। সঠিক সময়ে তিনি বাঙালি হিন্দুর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইনসঙ্গত দাবি পেশ করলেন যার মাধ্যমে অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার নামে বাঙালি হিন্দুকে পদপিষ্ট করার যন্ত্র সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের কব্জা থেকে মুক্ত করে ভারতের সীমানার মধ্যে থেকে বাঙালি হিন্দুর জন্য একটা পৃথক বাসভূমি তৈরি করা যায়। ব্যবস্থা অনুসারে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা আইনসভার সদস্যবৃন্দ বাংলা বিভাজনের প্রস্তাবের বিষয়ে তিনটি পর্যায়ে ভোটদান করেন। কক্ষের যৌথ অধিবেশনে আইনসভার সকল সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে ১২৬টি ভোট বিভাজনের বিপক্ষে এবং ৯০টি ভোট গণপরিষদে (ভারত) যোগদান করার পক্ষে পড়ে।

তখন বাংলার মুসলমান সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে একটি পৃথক অধিবেশনে একটা মতামত পাশ হয় ১০৬-৩৫টি ভোটের দ্বারা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে এবং নতুন আইনসভায় (পাকিস্তান) যোগদানের পক্ষে। তৎপরে এক পৃথক অধিবেশনে বাংলার অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের দ্বারা প্রদেশ ভাগের পক্ষে ৫৮-২১টি ভোট পড়ে।

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোনো পর্যায়ে বিভাজনের পক্ষে একটি মাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'বাংলা বিভাজনে'র সূচক হবে, এই সূত্রেই আইনসভার ভোটাভুটি প্রদেশ বিভাজনের পক্ষে যায় এবং ফলস্বরূপ ২০ জুন সভার কার্যবিবরণীতে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন পশ্চিমবঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের অধীন এবং পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্তর্গত প্রদেশ হিসাবে সৃষ্টি করা হয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাই বলা যায়, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গের রূপকার।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭ জুলাই একটি গণভোট গৃহীত হয়, এতে শ্রীহট্টের নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দেন পূর্ববাংলায় যোগদানের পক্ষে। পুনরায় সীমানা নির্ধারণ কমিশন প্রধান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দুটি নতুন সৃষ্ট প্রদেশের সীমানা ভাগ করে দিতে হবে। আর ভারতীয় স্বাধীনতা আইন-১৯৪৭ দ্বারা পাকিস্তান এবং ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় যথাক্রমে ১৪ এবং ১৫ আগস্ট। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লীগের বিভাজন নীতি এবং সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষার জন্য কিছু বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেন। মুখার্জী এবং তাঁর অনুগামীরা সর্বদা সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের হিন্দু রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যাতে মুসলমান জনগণের সুস্থ, সমৃদ্ধশালী ও সুরক্ষিত অবস্থানটি প্রাথমিক গুরুত্বের বিষয় রূপে পরিগণিত হয়।

কিন্তু পূর্ব বাংলার নোয়াখালি গণহত্যা কাণ্ডে মুসলিম লীগের দ্বারা বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে হত্যার কারণে ড. শ্যামাপ্রসাদের বিশ্বাস আহত হয়েছিল। তারপর থেকেই ড. মুখার্জী বাঙালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় কঠোর মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ডঃ মুখার্জী প্রাথমিক ভাবে ভারত বিভাজনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালের

দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের দ্বারা পরিচালিত সরকার ও মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানের অধীনে হিন্দুদের ভাগ্যকে নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলতে চাননি। প্রকৃতপক্ষে ডঃ মুখার্জী তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রভাবের দ্বারা জিন্নাহ, সোহরাবর্দী এবং অন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কার্যত আচ্ছন্ন করে ফেলেন। তৎকালীন মুসলমান গরিষ্ঠ বাংলায় ভারতকেশরী গর্জন করে ওঠেন যাতে বাংলার পশ্চিম অংশে বাঙালি হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হিন্দু সংখ্যাবহুল এলাকা নিয়ে এক পৃথক রাজ্য সংগঠিত হয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি পাকিস্তান ভাগ করে বাঙালি হিন্দুর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির দাবি না জানাতেন, তাহলে কি হত? তাহলে নিশ্চিতভাবেই জেহাদি মুসলমানদের কবল থেকে বাঙালি হিন্দু রক্ষা পেত না। আর বাংলাদেশে আজ বাঙালি হিন্দু কিংবা পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দুকেও আজ সেই একই পরিস্থিতির শিকার হতে হোত। ঈশ্বর যেন এই বাঙালি হিন্দু নেতাকে প্রেরণ করেছিলেন— তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত শান্তিকামী, উদার, সহিষ্ণু এবং সংস্কৃতিপরায়ণ হিন্দুর পরিত্রাতা রূপে তাঁর গুরুদায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করেছিলেন।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতি বছর বাঙালি হিন্দুর অবশ্যই উচিত পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা। তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ড. মুখোপাধ্যায়ের দার্শনিক চিন্তাধারাকে সম্মান জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদান বর্তমান প্রজন্মের পশ্চিমবঙ্গবাসীর একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

ভারতের অন্য রাজ্যগুলি যখন নিজ নিজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে তৎপর, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস পালন না করা এবং সেই সূত্রে নিজ কর্তব্য ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সরকারের অপরিসীম ঔদাসীন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অবশ্যই ব্যথিত করে। পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেই অবহেলিত। ■

তথ্যসূত্র :

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা। (২) বিদ্যুৎ চক্রবর্তী লিখিত বাংলা এবং অসমের বিভাজন (The Partition of Bengal & Assam) *(৩) দীনেশচন্দ্র সিংহ লিখিত 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং 'নোয়াখালি গণহত্যা'। (৪) 'স্বস্তিকা' পত্রিকা।*

(২৩শে জুন শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

লক্ষ্য পূরণে রাজ্যই শেষ কথা বলবে

অরবিন্দ পানাগারিয়া

সম্প্রতি আমি বলেছি যে, নতুন সরকার যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সংশোধনের দায়িত্ব রাজ্যের হাতে ছেড়ে দিক। আমার সুপারিশ ছিল— এই সংস্কারে সংবিধানে একটা ধারা সংযোজন করলেই বিষয়টা সমাধান হয়ে যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো কেন্দ্রীয় আইন সংশোধন করতে গেলে সংবিধান সংশোধন জরুরি। আর এই জন্য নতুন সরকারের চাই রাজ্যসভায় গরিষ্ঠতা এবং এই সমস্যা বেশ বড়সড়, কারণ বর্তমান সরকারের রাজ্যসভায় সেই গরিষ্ঠতা নেই।

আমার দুই সুহৃদ— একজন বরিষ্ঠ নীতি নির্ধারক এবং অপরজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক যাঁদের এই বিষয়ে তিন দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরাই এই আইন প্রণয়নে দুটি বিকল্প সূত্রের কথা বলেছেন। প্রথমত, সংবিধান রাজ্যগুলিকে যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ওপর কেন্দ্রীয় আইন সংশোধন করতে অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা দেশের রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। এই অনুমতির বলে বলীয়ান হয়েই রাজ্যগুলি তাদের সুবিধা মতো যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সংশোধন করে নিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির অনুমতি কার্যরূপায়ণের অনুমতি যার জন্য আইন সংশোধনের দরকার নেই। নতুন সরকার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে রাজ্যগুলি একটি সময়সীমার মধ্যে তাদের রাজ্যের আইন সংশোধনের প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রের কাছে পেশ করতে পারে।

দ্বিতীয় রাস্তা হলো, সংস্কার প্রণয়নে আইন রচনার উপায় খোঁজা। অধিকাংশে ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিষয়টা বৃহত্তর ক্ষেত্রের বিচার্য বিষয় হয় কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে। পরিবর্তিত প্রক্রিয়া অনেক সময়েই যে সংস্কার চাওয়া হয়েছে তা পূরণ করে।

যেমন শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭-এর পরিচ্ছেদ ভিবি-তে বলা হয়েছে, কোনও শিল্প সংস্থা যেখানে ১০০ জন বা তার অধিক শ্রমিক কাজ করে সেখানে পরিচালক সংস্থা সরকারের অনুমতি ছাড়া ছাঁটাই করতে পারবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায় না।

কিছু সরল সংশোধনই পারে এই ধারাকে পরিবর্তন করতে। বিশেষত এই আইনে ছোট্ট একটি সংশোধন ছাঁটাই প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে পারে এবং সেটা হলো ছাঁটাই আবেদনের অনুমতি দিতে সরকার যদি অযথা বিলম্ব করে, তবে ধরে নিতে হবে যে, সরকারি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তাহলে এটা দাঁড়াবে যে, অযথা বিলম্বের দায়ভার সরকারের ওপর বর্তাবে।

এইভাবে সময় নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দুটি সমস্যা আসতে পারে। প্রথম হলো— কীভাবে সরকার দায়বদ্ধ হবে যদি আবেদনটি অসম্পূর্ণ হয়? এর উত্তর হলো এই আইনে একটা সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে এক নির্দেশিকা জারি করে।

কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ আসবে যদি আবেদনটি অন-লাইনে পেশ করা হয়। এতে কোনওরকম অসঙ্গতি থাকবে না, চটজলদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে। পরন্তু কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা থাকবে যার বলে কোনও অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আবেদন বাতিল করতে পারবে। সেবি (সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) সফলভাবে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পেরেছে আপিও (অ্যাসিস্টান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার্স)-র আবেদনের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় আপত্তি ঘটবে সময়সীমার ক্ষেত্রে। এখানে সরকারের সঙ্গে আবেদনকারীর সংঘাত ঘটতে পারে যে, সরকার আবেদনের ব্যাপারে অবিচার করতে পারে। কিন্তু যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত হতে পারে তাই সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে আদালতে বিভিন্ন স্তরের ব্যয় নির্বাহ খরচ এবং এর ফলে যে দুর্নাম হবে সেই বিষয়েও।

আরেক ধরনের প্রতিবাদ ঘটতে পারে, যেমন, কোনও সরকারি আধিকারিকের অবহেলায় কোনও আবেদনের সময়সীমা পেরিয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময়ে অনপযুক্ত আবেদনও মান্যতা পেয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর এরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিতাদেশ চাইতে পারে কিংবা সমস্যা মেটাতে সরকার আদলতে ওইসব আবেদন খারিজের আবেদন করতে পারে।

কেউ বলতেই পারে এহেন প্রক্রিয়ায় বিলম্বিত হবে আবেদন এবং এর দায় স্থানান্তর হবে ব্যুরোক্র্যাট থেকে আদালতে। কিন্তু বিষয়টা তাই নয়। কারণ আধিকারিকদের অন্যায় নেতিবাচক সিদ্ধান্ত অথবা পরিবর্তে অনপযুক্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আদালতে সুরক্ষা হবে, ফলে ওই আধিকারিকের ভবিষ্যৎ প্রোমোশন আটকে যেতে পারে। নতুন সরকারকে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে প্রতিটি মন্ত্রকই তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বদলে ফেলে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যাতে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আসে এবং এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তার ফলে পৌঁছবে আবেদনকারীর কাছে। ফলে এই নিয়ম লিপিবদ্ধ হবে মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে। যেমন ৪৫ পৃষ্ঠায় জমি অধিগ্রহণ আইনের খুঁটিনাটি এবং প্রক্রিয়াও ব্যক্ত করা হয়েছে। আইনের সংস্কার প্রয়োজন। কারণ সব রাজ্যের আইনি সংস্কার দরকার এবং কেন্দ্রীয় স্তরে তা করতে গেলে সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন ডেকে তা পাশ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই সংস্কার শুরু কোথায় হবে? এতকাল নির্মাণশিল্প ছিল শ্রমিকলব্ধ শিল্প। সুতরাং গুজরাট হলো শ্রম আইন সংস্কারের পীঠস্থান। এই রাজ্যে রয়েছে ভাল সড়ক ব্যবস্থা এবং বন্দর, সর্বত্র ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এবং সাধারণভাবে রাজ্যটি শিল্প সহায়ক। সুতরাং শ্রম আইনের সংস্কার এই রাজ্যে প্রয়োজন, কারণ এখানকার নির্মাণশিল্প শ্রমিক-নির্ভর।

পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে যদি এই সুদূরব্যাপ্তি সংস্কার সম্ভব তবে কেন্দ্রে সরাসরি আইন প্রবর্তন না করেও তবে পূর্ববর্তী সরকারগুলি কেন সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি? এর সম্ভাব্য জবাব হতে পারে এই সংস্কারের ফলে আমলা, রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা খর্ব করবে এবং বে-আইনি রোজগারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। দেখতে হবে দেশের নবীনতম সরকার কতটা দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে পারে প্রশাসনে। কারণ এরা দক্ষতা ও স্বচ্ছতায় ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ■

(লেখক কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক। সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

নেত্রদান মহাদান

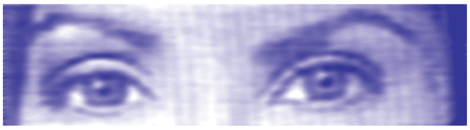

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

নতুন দিগন্তে ভারতীয় অর্থনীতি

অম্লানকুসুম ঘোষ

দেশ বা রাষ্ট্রকে যদি একটি সুরম্য হর্ম্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সেই হর্ম্যের স্তম্ভগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অর্থনীতি। শিক্ষানীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির মতো অর্থনীতিও যে কোনো রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় অর্থনীতি এক অন্ধকার কানাগলিতে পথ হারিয়েছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে পট পরিবর্তনের পরে সাধারণ মানুষের এখন একটাই জিজ্ঞাস্য— এই পরিবর্তনের প্রভাব কি অর্থনীতির ওপরেও পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তরের একটু অন্বেষণ করা যাক।

সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার আগে দেখা উচিত সমস্যাটা কি? ভারতীয় অর্থনীতি সাম্প্রতিক অতীতে যে সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়েছিল তার মূলত তিনটি মুখ। এক, বাণিজ্যিক ঘাটতি (current A/c deficit) ও সরকারি আয়-ব্যয় ঘাটতি (fiscal deficit) উভয়েরই ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হওয়া। দুই, জিডিপি বৃদ্ধির হার ক্রমাগত নিম্নমুখী হওয়া। তিন, মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হওয়া। দেখা যাক এই তিন সমস্যার সমাধানে নবগঠিত সরকার এখন অবধি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

> “পেট্রোলিয়াম-জাত সম্পদ কম থাকায় ভারতে কয়লাই প্রধান জ্বালানি খনিজ আর গত ইউপিএ সরকারের আমলে এই কয়লা খনির বন্টন নিয়ে দশ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল। যে অর্থ দুর্নীতির পথে গিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক ও স্বদেশী কালোবাজারকে কাঁপিয়ে তুলেছিল সেই অর্থই এবার সঠিক পথে এসে দেশের মোট উৎপাদনকে করে তুলবে আকাশচুম্বি।”

বাণিজ্যিক ঘাটতি হলো কোনো এক আর্থিক বছরে দেশের মোট আমদানি ও মোট রপ্তানির বিয়োগফল। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে যে সব দেশের তাদের মধ্যে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। সরকার গঠনের পরই প্রতিবেশী দেশ চীনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য বিদেশমন্ত্রকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশিই চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর চেষ্টা শুরু করেছে সরকার। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়— চীন ছাড়াও ভারতের অন্য যেসব ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশ আছে (যারা মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন আমন্ত্রিত ছিল) তাদের সঙ্গে নানান রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও এবং সে সব বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান খোঁজার চেষ্টা চললেও সমান্তরালভাবে তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার চেষ্টাও চলছে। অর্থাৎ রাজনীতির সমীকরণ অর্থনীতির অভিমুখকে প্রভাবিত করেনি।

জিডিপি বৃদ্ধির হারকে উর্ধ্বমুখী করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা জরুরি। নতুন সরকার শুরুতেই এ ব্যাপারে কড়া নজর দিয়েছে। কোল ইন্ডিয়ার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্লু প্রিন্ট রচনা করতে বলা হয়েছে শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পেট্রোলিয়াম-জাত সম্পদ কম থাকায় ভারতে কয়লাই প্রধান জ্বালানি খনিজ আর গত ইউপিএ সরকারের আমলে এই কয়লা খনির বন্টন নিয়ে দশ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল। যে অর্থ দুর্নীতির পথে গিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক ও স্বদেশী কালোবাজারকে কাঁপিয়ে তুলেছিল সেই অর্থই এবার সঠিক পথে এসে দেশের মোট উৎপাদনকে করে তুলবে আকাশচুম্বি।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে আর একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ স্মরণীয়। মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই কালো টাকা উদ্ধারের জন্য নিরপেক্ষ ও দক্ষ কমিটি গড়ে তাদের দিয়েছেন স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার। উইকিলিকস ও অন্যান্য নানা সূত্র অনুসারে এই কালো টাকার পরিমাণ প্রায় বাহাত্তর লক্ষ কোটি টাকা। যা দেশের ছ' বছরের বাজেটের সমান। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সত্যিই উদ্ধার হলে দেশের অর্থনীতি উন্নতির কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা সাধারণের বিবেচনার অতীত। পরিমাণের দিক থেকে কম হলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে

মোদী সরকারের আর একটি পদক্ষেপ স্মরণীয় তা হলো মন্ত্রীদের আত্মীয়দের কাউকে আপ্ত সহায়ক বা মন্ত্রকের অন্য কোনও চাকরিতে নিয়োগ করা যাবে না। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী পবন বনশলের মামা-ভাগ্নে কীর্তির কথা স্মরণ রাখলে এই পদক্ষেপের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির আরেকটি বড় শর্ত হলো সাংবিধানিক সবকটি কাঠামোর মধ্যে পারস্পর্য বজায় রেখে কাজ করা। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও মোদী সরকার এই সত্যটি বিস্মৃত হননি। সবকটি রাজ্য সরকারের (বিরোধি দল শাসিত রাজ্যগুলিও আছে) সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার কথা বলেছেন তিনি। নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধিতারও ইতি হয়েছে একথা জানিয়ে প্রশাসন ও রাজনীতিকে পৃথক করেছেন শুরুতেই।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে নতুন বিনিয়োগ দরকার। বিনিয়োগ টানতে হলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার সর্বাগ্রে। নতুন প্রধানমন্ত্রী সে কথাটি বিস্মৃত হননি। ক্ষমতায় এসেই তাই বুলেট ট্রেনের খুঁটিনাটি জানার জন্য শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের পাঠিয়েছেন জাপান। এই পদক্ষেপ হয়তো উন্নয়নের স্বপ্নের সামান্য আভাস মাত্র, ভবিষ্যৎ আরও কী কী পদক্ষেপের সাক্ষী করে আমাদের তা আমাদের বর্তমান কল্পনাশক্তির অতীত।

বিনিয়োগ-বান্ধব পদক্ষেপের কথা না উল্লেখ করলে বড় ভুল হবে। সেটি হলো, মোদী সরকার বিনিয়োগকারীদের নতুন বিনিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি সহজ করেছেন নিয়েছেন এক জানলা নীতি। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা ছাড়াও আধুনিক প্রতিযোগিতাময় বাজারে বিনিয়োগকারীদের যে মহামূল্যবান সময় এর ফলে বাঁচবে তা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে চুম্বকাভিমুখী লৌহের মতো।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তার ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন মোদী। সংবিধান অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই স্বাধীনতা প্রাপ্য সরকার নির্বিশেষে। কিন্তু পূর্বতন সরকারের অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম পরোক্ষ চাপের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যেভাবে বারংবার প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত উদ্যোগ মাঠে মারা গিয়েছিল। এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার প্রাপ্য ও প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির দৈত্যকে বোতলবন্দী করবে এই আশায় বুক বাঁধা যায় সহজেই।

কাজের স্বাধীনতার ব্যাপারে মোদী সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ অতি প্রশংসনীয়। সচিব স্তরের সমস্ত আমলার সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের যে কোনো প্রয়োজনে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই যোগাযোগ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। অর্থাৎ মন্ত্রীদের রাজনৈতিক চাপ যাতে কোনও ভাবে কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ। এতে কাজের গতিও বৃদ্ধি পাবে।

মোদীর অর্থনীতির ব্যাপারে বিরোধীদের বরাবরের অভিযোগ মোদী শুধু শিল্পক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অর্থনীতির অপর দুটি ভিত্তি কৃষি ও পরিষেবাকে তিনি অবহেলা করেন। এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্বের ছোট্ট ইনিংসে তিনি কিন্তু কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্র নিয়েও বিশ্লেষণী চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কৃষিক্ষেত্রে মোট ফসলের তিরিশ শতাংশ নষ্ট হয় উপযুক্ত মজুতের অভাবে আর নষ্ট না হওয়া ফসলেরও সঠিক দাম পান না চাষিরা, মুনাফা যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। এই দুই সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন মোদী। এতে যেমন মোট কৃষি উৎপাদন বেড়ে মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম পরাবে।

অন্যদিকে অধিক দাম পেয়ে লাভবান কৃষকরা কৃষিতে আরও বিনিয়োগ করতে পারবে। ফল— উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি। পরিষেবা ক্ষেত্রের ব্যাপারেও আপাতত একটি স্বপ্ন মোদী দেখিয়েছেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত নৌ-যোগাযোগ গড়ে তোলার কথা বলেছেন সরকারের জাহাজ-পরিবহণমন্ত্রী। এতে জ্বালানী খরচ যেমন কমবে তেমন পরিষেবাক্ষেত্র বিকশিত হয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তাছাড়া পুরো ব্যবস্থাটি হবে পরিবেশবান্ধব যা বিশ্বব্যাঙ্ক বা এডিবি'র অনুদান টেনে আনতে পারে।

বিশ্লেষণ করা হয় সংখ্যাতত্ত্বের রাশিসমূহ ও অর্থনীতির নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু সেই বিশ্লেষণ অনেকটাই দূর নির্দেশিত। সেই বিশ্লেষণে ভুল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু দেশী বিদেশী লগ্নিকারীরা যখন লগ্নি করে নিজেদের অর্থ তখন তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে তা করে না। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে শেয়ার বাজারের প্রতি লগ্নিকারীদের যে অসাধারণ আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে তা থেকে এটা পরিস্কার যে পোড়খাওয়া লগ্নিকারীরা ভারতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Morning shows the day'। কথাটি সবসময়ে সত্য না হলেও অনেক সময়ই সত্য হিসেবে দেখা দেয়। নরেন্দ্র মোদী নামক নবারুণের নবোদয়ে যে আলোকোজ্বল প্রভাতের সৃষ্টি হয়েছে দেশের অর্থনীতির আকাশে তা সমগ্র দিনের ইঙ্গিতবাহী হবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। কিন্তু প্রভাতে গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত যে দিকনির্দেশ করছে তা উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই বার্তা বহন করছে বলে মনে করছে তামাম বিশেষজ্ঞ মহল। যাত্রা সবে শুরু হয়েছে, তবে দূর দিগন্তে যে সোনালি আভা দেখা যাচ্ছে তা আশান্বিত করছে সকলকেই, ভরসা দিচ্ছে— একথা মনে করিয়ে যে পথটি বাছা হয়েছে সঠিক-ই।

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ

কেন্দ্রে নতুন সরকারের কার্যকলাপ

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

ভারতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এক পক্ষকাল শেষ হয়েছে। এই এক পক্ষকালের মধ্যে মোদী সরকার কী কাজ করেছেন সে বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে ব্রহ্মা একটি সভা ডেকেছেন। সেই সভায় কোন তারকা নেই? শিব, নারায়ণ, যমরাজ, অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়, কার্তিক গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, উর্বশী এবং অপ্সরা, কিন্নরীরাও রয়েছেন।

সভার শুরুতে খুব গোলমাল শুরু হলো। দুর্বাসা একটু দেরিতে সভাস্থলে এসে চারিদিকে ক্রুদ্ধ চোখে বাণের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন। উপস্থিত সকলে তাঁর দিকে সভয়ে তাকালেন। যদিও ব্রহ্মার সভায় গাঁজা খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তবু শিব নিশ্চিন্ত মনে গাঁজা খাচ্ছিলেন। শিবের এমন আচরণে কেউ আপত্তি করছিলেন না বা বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন না। সকলে তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা প্রবেশ করলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, শুধু দুর্বাসা উঠলেন না। ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট চোখে দুর্বাসার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকাল অনেকে কার্টসি বোধ হারিয়ে ফেলেছে দেখছি। দুর্বাসা বুঝলেন একথা তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাঁর মাথা আবার গরম হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, ব্রহ্মাদা, এখানে উর্বশী অপ্সরী কিন্নরীরা কেন? এই প্রাজ্ঞজনদের সভায় এই নাচুনী, গাওনীদের কী প্রয়োজন?

উর্বশী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই অবজেক্ট। আমি আমাদের সম্বন্ধে এমন আগলি শব্দ ইউস করার জন্য প্রতিবাদ করছি।

দুর্বাসা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াননি বলে ব্রহ্মার এমনিতে দুর্বাসার উপর রাগ ছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দুর্বাসা এমন আনপার্লামেন্টারি কথা বলা খুবই অন্যায় হয়েছে। আইদার তুমি কথা উইথড্র কর, নয়তো চলে যাও। ব্রহ্মা এমন কঠোর কথা বলবেন কেউ ভাবতে পারেননি। দুর্বাসাও না। তিনি আর বাক্য ব্যয় না করে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে নিরস্ত করলেন না। সভা থম থম করতে লাগল। সৃষ্টিকর্তার এমন ব্যবহারের কারণ কারোর বোধগম্য হলো না।

এমন সময় নারদ উপস্থিত হলেন ঢেঁকিতে চড়ে। সবাই পৃথিবীতে নরেন্দ্র ভাইয়ের নতুন মন্ত্রিসভার দু'সপ্তাহের কাজের খবর জানার জন্যে ব্যগ্র হলেন। নারদ 'জয় ব্রহ্মা' বলে হাত জোড় করে ব্রহ্মার সামনে দাঁড়ালেন। নিজের জয়ধ্বনি শুনে ব্রহ্মার রাগ জল হয়ে গেল। বললেন বৎস, নরেন্দ্র ভাইয়ের খবর বল। তুমি আমার খুব ওবিডিয়েন্ট রিপোর্টার।

নারায়ণ, মহাদেব মায় সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। খানিক আগেই না ব্রহ্মা নারদের অনুপস্থিতে নারদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ও ভীষণ ডিসওবিডিয়েন্ট হয়েছে। ওকে স্যাক করার দরকার দেখছি।

নারদ হাত জোড় করে পনেরো দিনের ঘটনা গড় গড় করে বলে গেলেন। নারায়ণ বললেন, খুব ভালো রিপোর্টাজ হয়েছে। উর্বশী ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রভু, ওঁকে শ্রেষ্ঠ রিপোর্টার হিসেবে পদ্মভূষণ উপাধি দিন। গণেশ বললেন, ওঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দেওয়া হোক।

তারপর ব্রহ্মা সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকারের এই পনেরো দিনের কাজের রিপোর্ট শুনে তোমাদের কোনো বক্তব্য আছে? সকলে সমস্বরে বললেন, নরেন্দ্র মোদীর পনেরো দিনের প্রশাসন উত্তম, আমরা খুব আশাবাদী। তিনি যে একজন কড়া প্রশাসক তা এই কদিনে তার পরিচয় রেখেছেন।

ব্রহ্মা বললেন, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তাঁর কী দরকার ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা? শত্রুর সঙ্গে কোনো ভদ্রতা নয়। শত্রু কেবলমাত্র পিটুনির ভাষা বোঝে। ৩৭০ ধারা বাতিল করা হবে বলে তাঁর এক মন্ত্রী বলেছিলেন, তাতে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে বলেছেন অমন করার চেষ্টা করলে তাঁরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ভাববেন। অমনি সেই মন্ত্রী বললেন, আমি অমন কথা বলিনি। নরেন্দ্র মোদীও চুপ করে রইলেন। তাছাড়া শুনছি তাঁর দলে মুসলমানরা বানের জলের মত সদস্য হিসেবে ঢুকছে। এতে নরেন্দ্র মোদীরা খুশি হচ্ছেন। তাঁরা ভুলে যান, মুসলমানরা যখনই যে দল তৈরি হয় অমনি তাতে ঢুকে পড়ে এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারকে চাপ দেয়। মুসলমানদের দলে নেওয়ার কী দরকার। ওরা পঞ্চম বাহিনী। দেশের ও জাতির শত্রু। মুসলমানেরা কখনও হিন্দুদের জন্য দরদ দেখায় না, হিন্দুদের কী দরকার ওদের দরদ দেখানোর? তা ছাড়া মোদী দেখিয়ে দিয়েছেন ঠিক মতো হিন্দুত্বের ডাক দিতে পারলে মুসলমানদের সাহায্যের দরকার হয় না। এখনই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিত ছিল, তেমনি উচিত ছিল রাম মন্দির তৈরি করার কথা ঘোষণা করা এবং তার জন্য কমিটি তৈরি করে দেওয়া। যত দেরি করবে, যত গড়িমসি করবে ততই শত্রুর ভয় চলে যাবে এবং ততই সঙ্ঘবদ্ধ হবে। নরেন্দ্র মোদীদের মুসলমান রাজনীতি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইসলামের প্রতিষ্ঠা ওদের একমাত্র লক্ষ্য এবং ওরা বিধর্মীদের এতটুকু সহানুভূতি দেখায় না। হিন্দুদের এই শিক্ষা নিতে হবে। হিন্দুদের গীতা, উপনিষদ নয় কোরান, হাদিস ও মহম্মদের জীবনী নিয়মিত পড়ে তা হিন্দু জীবনে রূপ দিতে হবে। প্রতি মুসলমান দেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য মন্ত্রণালয় থাকে, মোদী সরকারের তেমনি হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য মন্ত্রণালয় তৈরি করার দরকার। এত দিনে সাচার কমিটির রিপোর্ট বাতিল ও হজের ভর্তুকি তোলার উদ্যোগ নিতে হোত। এসব না করার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকার সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছি। মনে রাখতে হবে প্রথম রাত্রে বেড়াল না মারলে কোনো দিনই বেড়াল মারা যায় না। এখন কিছু ভালো লাগছে না। তাই এখন সভা শেষ করছি। পরে আবার সভা ডাকবো বলে ব্রহ্মা ধীর পায়ে উঠে গেলেন। ■

চিঠিপত্র

মুসলমান ভোট

সারা ভারত তো বটেই এমনকী সারা পৃথিবীতে শিক্ষিত রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলে বাঙালির একটা সুনাম ছিল কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নজিরবিহীন ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসৌজন্য ও অপমানকর ভাষায় আক্রমণ করেছেন তাতে বাংলা ও বাঙালির সম্মান আজ ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। অনেকেই বলেছেন যে রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট নিজের দিকে টেনে আনতে মমতা এই সব বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, মমতা কি সত্যই মুসলমান ভোট পান? তা যে তিনি পাননি তার মস্ত প্রমাণ মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দুই দিনাজপুর। এই তিন মুসলমান অধ্যুষিত জেলা যেখানে পশ্চিমবঙ্গের অন্ততঃ ৭৫ শতাংশ মুসলমানের বাস সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন দাঁত ফুটোতে পারে না। এবার ও পারেনি। এই তিন মুসলমান অধ্যুষিত জেলায় তৃণমূল একটা আসনও পায়নি। রাজ্যের অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল যথা দেগঙ্গা, ক্যানিং, ভাঙড় ইত্যাদিতে তৃণমূল জিততে পারে না অধিকন্তু এত তোয়াজ তোষণের পরও এবার মুসলমান ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদের তৃণমূলকে ভোট দিতে নিষেধ করেছেন। তৃণমূল এবার ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে যা গত পঞ্চায়েত ভোট থেকে ৫ শতাংশ কম। মোদীর সঙ্গে সংঘাতে না গেলে তৃণমূলের আসন সংখ্যায় বিশেষ হের ফের হত না। মমতা ও তৃণমূলের এমপি-রা দিল্লীতে মাথা উঁচু করে চলতে পারতেন। বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও কেন্দ্রীয় সরকারে তৃণমূল বিশেষ গুরুত্ব পেত। চাইকি মমতা রেলের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেয়ে যেতে পারতেন। তাতে পাতাল রেল সহ রেলের প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে প্রজেক্টগুলি গতি পেত। বিরাট অঙ্কের ঋণমকুব সহ অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সুবিধা হত।

আর এখন কি হল? ৩৪টা আসন জিতেও মমতাকে চুপ করে থাকতে হলো। বিরোধী দলের মর্যাদা পাওয়ার জন্য এখন তাঁকে অন্যান্য দলের উমেদারি করতে হচ্ছে।

এখন তাঁদের ৩৩৬ এর এক অজেয় বাহিনীর ধাক্কা সামলাতে হিম সিম খেতে হবে। সব থেকে করুণ অবস্থা ও ব্রায়েনের। রাজ্যসভায় সেই বীরকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো?

সুহাস বসু,
কলকাতা-৬০।

রাজ্য বিজেপি-কে অনুরোধ

রাজ্য বিজেপি নেতাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা কলকাতায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে, এখন থেকেই, আগামী পুরসভা নির্বাচন ও ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সফর শুরু করুন। দরকার মতো অমিত শাহ বা ওঁর মতো কুশলী সংগঠককে মাঝে মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।

প্রয়াত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় পবিত্র কুমার ঘোষ মহাশয় লিখিত তথ্য অনুসারে নেতাজী প্রতিষ্ঠিত আই এন এ-র বিপুল অর্থ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আত্মসাৎ করেছিলেন। সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবগত ও অবহিত করুন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করুন।

মুখার্জি কমিশনের নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত রিপোর্ট যা কংগ্রেস সরকার গোপন করে রেখেছিল— তাকে এবং নেতাজী সম্পর্কিত সমস্ত গোপন ফাইল ও তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন।

দার্জিলিংকে বাংলা থেকে পৃথক করে গোর্খাল্যান্ড করার দাবি বাংলার বিজেপি যেন কোনো ভাবেই মেনে না নেয়। তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। তাছাড়া ভারতের নিরাপত্তার জন্যও গোর্খাল্যান্ড হওয়া সমীচীন নয়।

রাজ্য জুড়ে বিজেপি-তে যোগদানের যে ঢল নেমেছে, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনো ভাবেই যেন দাগি, অপরাধী, সমাজবিরোধী, আদর্শহীন, ধান্দাবাজদের দলে স্থান না দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আপ্তবাক্যটি স্মরণ করিয়ে দিই— 'দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'

পরিশেষে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের ওপর শাসকদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করা হোক এবং তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে এই আক্রমণকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা হোক।

অনিতা মল্লিক,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

সাহসী পদক্ষেপ

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সেজন্য মোদীজীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কালোটাকা উদ্ধারের জন্য তিনি কমিটি গঠন করেছেন। দেশের গরিব মানুষের করের টাকা যারা ফাঁকি দিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছেন, সেই টাকা উদ্ধারের দাবি বহুদিনের। নেহরু আমল থেকে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে যে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল, যা আর কোনো প্রদেশের মানুষ সেই সব সুযোগ পেত না। এই দু'টি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা দেশের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে।

কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব রাখছি :

■ ভারতের নাম 'India'র পরিবর্তে 'হিন্দুস্থান' রাখা হোক।

■ নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের, রহস্য উন্মোচন করা হোক। নেতাজী জীবিত না মৃত, নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে? এই রহস্য উন্মোচন করা জাতীয় কর্তব্য। এযাবৎ

যে তিনটি নেতাজী তদন্ত কমিশন দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল তা নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বশেষ মুখার্জি তদন্ত কমিশনও সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। তার কারণও ছিল— কংগ্রেসি সরকার কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি।

ভারত সরকারের মহাফেজখানায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফাইল আছে, যা গোপন করে রাখা হয়েছে। মুখার্জি কমিশনকেও দেখতে দেওয়া হয়নি। নেহরু বহু ফাইল পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। রাশিয়া সরকারের নিকটও নেতাজী বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আছে। ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া রাশিয়া দেখাতে রাজি নয়। ভারত চাইলেই রাশিয়া দেখাতে রাজি। নেতাজী রহস্য 'রহস্যই রয়ে গেল'। কংগ্রেসসহ কোনো রাজনৈতিক দলই গদি হারানোর ভয়ে চায় না নেতাজী রহস্য উন্মোচন হোক। আমরা মোদী সরকারের নিকট আশা করব সেই রহস্য উন্মোচনে তারা মনোযোগী হবে।

অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,
নতুনপাড়া, কোচবিহার।

অন লাইন ভর্তির খেসারত

মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে শিক্ষামন্ত্রিত্ব খোয়ালেন ব্রাত্য বসু। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি এখন 'ব্রাত্য', প্রাক্তন। অন লাইনে ভর্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণাই তাঁর যে কাল হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

কারণ ছাত্র ভর্তির সঙ্গে রাজনীতি যুক্ত। বাম আমলের ন্যায় এ আমলেও শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে রাজনীতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক দুর্গে। বাম রাজত্বে শিক্ষাঙ্গন ছিল বামেদের দখলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদ দখল করত বাম ছাত্ররা, ভর্তির ফর্ম বিলি করত তারা, ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সংগঠনের সদস্য করে নেওয়া এবং অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়াও ছিল তাদের ইতিকর্তব্যের মধ্যে। তাছাড়া ছাত্রসংসদ দখলে রাখার মধ্যে ছিল বিরাট আর্থিক লাভের ব্যাপারটাও। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল এক ধরনের ব্যবসা— টুপাইস কামানো। বাম রাজত্বের শিক্ষাঙ্গনে যা যা ছিল, তৃণমূল রাজত্বের শিক্ষাঙ্গনেও হুবহু সেসবই বর্তমান। তাই অনলাইনে ছাত্র ভর্তি চললে শাসকদলের ছাত্রসংগঠনের করেকম্মে খাওয়ার ব্যবসাই যেত লাটে উঠে! ছাত্রনেতাদের অনেকেই বেকার ও নিষ্কর্মা হয়ে। বন্ধ হয়ে যেত রাজনীতির আখড়া।

এ ব্যাপারে সদ্য হওয়া শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, প্রযুক্তিগত কারণে অনলাইনে ভর্তি হচ্ছে না। এখনও কিছু খামতি রয়ে গিয়েছে। একটি কমিটি গড়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু পার্থবাবুর এই যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের হয়রানি লাঘবের জন্য এবং ভর্তিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই রাজ্য সরকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করার। কিন্তু কী এমন অঘটন ঘটল যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ডিগবাজি খেতে হলো? রাজনীতির কারবারিদের অভিমত, শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে নির্ভেজাল রাজনীতি।

তবে সত্যি বলতে কী, এবার ভর্তি হতে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা প্রথম ভোটার। আগামীতে যে সব ভোট আসছে তাতে যদি তারা ও তাদের অভিভাবকরা তৃণমূলী হয়রানির প্রতিশোধ ভোটবাক্সে নেন, তাহলে তা কী শাসকদলের পক্ষে খুব সুখকর হবে?

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

পত্রলেখকদের প্রতি আবেদন

স্বস্তিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে পাঠকরা নিয়মিত পত্র লিখছেন— এ খুবই আনন্দের বিষয়। বেশিরভাগ পত্র দীর্ঘ হওয়ায় স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। পত্র লেখকদের প্রতি অনুরোধ ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্র লিখুন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন: ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা): ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন: ২৪১৫-৩৫৬৬

গুপ্তিপাড়ার রথ

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

গঙ্গার দুই তীরে দুই প্রাচীন নগর। পুবে শান্তিপুর, পশ্চিমে গুপ্তিপাড়া। নদীয়া আর হুগলী জেলার এই দুই প্রাচীন জনপদ বৈষ্ণব ভাবাদর্শের পীঠস্থান। শান্তিপুরের বিখ্যাত উৎসব রাসযাত্রা ও গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত উৎসব রথযাত্রা।

বস্তুত, বঙ্গের শ্রীক্ষেত্র মাহেশের পরেই রথযাত্রায় ঐতিহ্য ও আড়ম্বরের নিরিখে গুপ্তিপাড়ার স্থান। মাহেশের মতো প্রায় একমাস ব্যাপী মেলা না বসলেও আট-ন'দিনের মেলায় এখানেও মানুষের ভিড় উপচে পড়ে, সৃষ্টি হয় লোকারণ্য। কাছে দূরের ভক্ত, দর্শনার্থীর সমাগমে ঘটে মহাধূমধাম।

গুপ্তিপাড়ার রথের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এখানকার মন্দির তথা মঠ। তাই, রথযাত্রায় যাওয়ার আগে জেনে নেওয়া দরকার এখানকার মঠের বৃত্তান্ত।

গুপ্তিপাড়া প্রসঙ্গে প্রাচীন ছড়া হলো : 'বাঁদর শোভাকর মদের ঘড়া/ তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।' এক সময় এখানে চারদিকে বেশ ঝোপ জঙ্গল থাকায় বাঁদরের উৎপাত ছিল, শক্তিসাধনার কেন্দ্রভূমি হওয়ায় সাধনার অঙ্গ হিসাবে ঘড়া ঘড়া মদ্যপানেরও চল ছিল। আর ছিল পণ্ডিত প্রধান চট্ট উপাধিক শোভাকর বংশের সুনাম, সুখ্যাতি। কেউ কেউ ভাবেন গুপ্ত উপাধিক বৈদ্যবংশের জন্য স্থান নাম গুপ্তিপাড়া। বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন :

গুপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত।।

এক সময় সংস্কৃত শাস্ত্রে বহু পণ্ডিতের খ্যাতি জেলা বা প্রদেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁদের মধ্যে 'বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী' প্রণেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, 'শ্যামাল্পলতিকা' রচয়িতা মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, 'চিত্রচম্পূ রচয়িতা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈদিক ব্রাহ্মণ রামগোপাল বিদ্যাবাগীশও ছিলেন একজন অসাধারণ আগমবিদ।

শুধু মহাতেজা তর্কালঙ্কার, ন্যায়তীর্থদের হাঁকডাক নয়, বাক্‌চাতুর্যে এখানকার মেয়েরাও কম যেত না। একবার, দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সত্যদেব সরস্বতী বটগাছের তলায় একখানা ইঁটের উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন, দুই নারী যাচ্ছিল গঙ্গায় জল আনতে। একজন বলল, দেখ, লোকটা সন্ন্যাসী কিন্তু আরাম বোধ আছে। ইঁটকে বালিশ বানিয়েছে। সত্যদেব সরস্বতী ইঁট-টা সরিয়ে দিলেন। ফেরার সময় সেই নারী ফুট কাটল— দেখ, এ সন্ন্যাসীর শুধু আরামবোধ নয়, অভিমানও আছে।

এই সত্যদেব সরস্বতী ধর্মে ছিলেন শৈব; কথিত আছে, তিনি স্বপ্নে জানতে পারেন, রাধারানীর বিরহ যন্ত্রণা উপলব্ধির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল এখানে আত্মগোপন করেছিলেন, যার জন্য এ স্থান গুপ্ত বৃন্দাবনও। এই স্বপ্নদর্শনের পর সত্যদেব সরস্বতী এখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, আনুমানিক ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে এখানে আসেন।

শোনা যায়, সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ি থেকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে এনে গুপ্তিপাড়ার কাছে চরকৃষ্ণবাটি নামের গ্রামের এক নির্জন, জঙ্গলাচ্ছন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বর্তমান বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বৃন্দাবনচন্দ্র প্রথম এককভাবে পূজিত হতেন, পরে মোহান্ত রামানন্দ স্বামী বৃন্দাবনচন্দ্রের পাশে রাধারানীকে স্থাপন করেন, পরে এই মন্দিরে মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রার নিমকাঠের বিগ্রহ যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গুপ্তিপাড়া স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পাঁচিল ঘেরা বিশাল প্রাঙ্গণের মাঝে কয়েকটি মন্দির নিয়েই গুপ্তিপাড়ার মঠ; মঠের মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে বাঁ দিকে পড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। মন্দিরটি আটচালা, ঢালু ছাদ এবং বাঁধানো কার্নিশযুক্ত। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার সুন্দর, নয়নাভিরাম বিগ্রহ।

বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের পাশে বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির। মন্দিরসমূহের মধ্যে এটি-ই বৃহত্তম। প্রায় আট ফুট উচ্চতার ভিত্তিবেদির উপর ষাটফুট উচ্চতার এই মন্দির, একটি বড়ো চারচালার উপর একটি ছোট চারচালা, যা মন্দিরের সামগ্রিক সৌন্দর্য দান করেছে। মন্দিরের ভিতরের বারান্দায় এবং বিগ্রহ কক্ষের দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিভিন্ন পুরাণ প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। মৃৎ ফলকের মধ্যে চিত্ররূপ অঙ্কনে শিল্পীদের নৈপুণ্য বিস্ময়কর। বৃন্দাবনচন্দ্র আর কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির দুটির পেছনে বাংলার নিজস্ব রীতির জোড়বাংলার চৈতন্য মন্দির। ১৬৫০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটিই মঠের প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরটি উচ্চতায় ২৩ ফুট। মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দের বৃহৎ ও সুন্দর দারুমূর্তি। মন্দিরটি কালের ভারে জীর্ণ ও পতনোন্মুখ হয়ে পড়লে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, কলকাতা শাখার প্রচেষ্টায় সংস্কার হওয়ার ফলে আপাতত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

মঠের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ মন্দির বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর রামচন্দ্র মন্দির। পোড়ামাটির অলঙ্করণের জন্য শুধু হুগলী জেলার মধ্যেই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। ১৮২২ খৃস্টাব্দে শেওড়াফুলি রাজপরিবারের অর্থসাহায্যে এই মন্দির নির্মিত হয়। প্রায় সাতফুট উচ্চ ভিত্তিবেদির উপর এক চূড়াবিশিষ্ট চারচালা মন্দির। মন্দিরের গায়ে রাধাকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, রামায়ণের নানা খণ্ডচিত্র, সাধারণ নরনারী, লতাপাতার চিত্র এমন দক্ষতার সঙ্গে টেরাকোটার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে যাতে এই মন্দির দেখে টেরাকোটা শিল্পের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কথা মনে পড়ে যায়। দেওয়াল, মন্দিরের শিখর সর্বত্র পোড়ামাটির অলঙ্করণে এই মন্দির সমৃদ্ধ। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র,লক্ষণ, সীতাদেবীর সুন্দর দারুমূর্তি। শ্রীরামচন্দ্রের সামনে দণ্ডায়মান শ্রীমহাবীর হনুমান। তিনি ভক্তিনত ও জোড়হস্ত। তবে এখানে শ্রীরামচন্দ্র-সহ অন্যান্য বিগ্রহের সাধারণ, ঘরোয়া বেশ। হাতে নেই ধনুর্বান, মাথায় নেই চূড়া।

এই মঠে সারা বছর ধরে নানা উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয়, তবে সবচেয়ে বড়ো উৎসব রথযাত্রা। শ্রীধামপুরী বা মাহেশের মতো এখানেও যথাবিধি স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন জগন্নাথদেবকে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানো হয়। কিন্তু মহানন্দে স্নান করার পর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হু হু করে জ্বরের কাঁপন লাগে। জ্বরে আক্রান্ত হন জগতের নাথ। আসলে জগন্নাথ তো শ্রীগোবিন্দ, অনাদির আদিকৃষ্ণ ভগবান, স্নানের সময় প্রভুর স্মরণে আসে সেই মধুর বৃন্দাবনের ব্রজলীলা। কী সেই লীলা?

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একদিন অবগত হলেন, রাধারানীকে সকলে কলঙ্কিনী বলে; বলে 'কৃষ্ণকলঙ্কিনী'। তিনি রাধার এই অপবাদ দূর করার জন্য একদিন লীলাময় ভগবান এক অনুপম লীলা প্রকাশ করলেন। বাড়ি ফিরে তিনি সটান চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। যশোদা ভাবলেন, এই অবেলায় গোপাল এভাবে শুয়ে কেন! গায়ে হাত দিয়ে তিনি তো আঁতকে উঠলেন একি! গোপালের গায়ে প্রবল জ্বর, খবর পেয়ে ছুটে এলেন নন্দরাজ। গোপালের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যে!

ডাকা হলো বড়ো বড়ো বৈদ্যদের। কিন্তু কোনো বৈদ্যের কোনো ওষুধে কাজ হলো না। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এক বৃদ্ধ বৈদ্যের বেশ ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, এতো সাধারণ জ্বর নয় গো মা নন্দরানী। এ বড়ো বিরল জ্বর। সাধারণ ওষুধে ছাড়ার কথা নয়। এক কাজ করতে হবে, মা ছাড়া কোনো সতী সাধ্বী রমণীকে শতছিদ্রযুক্ত কলসে যমুনা থেকে স্নান করে জল এনে সেই জলে তোমার গোপালকে স্নান করাতে হবে। তবেই এই জ্বর ছাড়বে।

মা যশোদা ও নন্দবাবার মাধ্যমে এই খবর ব্রজবাসীরা জানলেন। অনেকে ভয়ে চেষ্টাই করলেন না। এগিয়ে এলেন রাধার ননদিনী কুটিলা। কিন্তু ছিদ্রযুক্ত কলসে জল ভরে পাড়ে ওঠার সময় পা পিছলে পড়ে

গেলেন; কুটিলা তো অপ্রস্তুত, লোকে হেসে অস্থির।

অবশেষে স্বয়ং রাধারানী শতছিদ্রযুক্ত কলসে জল ভরে এনে গোপালকে স্নান করালেন। স্নানান্তে দেখা গেল, গোপাল জ্বরমুক্ত, সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্রজবাসী একবাক্যে স্বীকার করলেন, রাধারানী মোটেই কলঙ্কিনী নন, এই ব্রজবৃন্দাবনে তিনিই সতী।

এই স্নানযাত্রার জলে সেদিনের রাধাপ্রেমের অমৃত-স্মৃতি স্মরণে জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে জ্বর আসে। জ্বরযুক্ত শরীরে পনেরো দিন থাকার পর তখন তিনি মাসির বাড়ি যাত্রা করেন। মাসির বাড়ি যাবার জন্য জগন্নাথের রথ সাজানো হয়। রথের সামনে থাকে বড়ো বড়ো দুটি কাঠের ঘোড়া। স্থানীয় মানুষ ও দর্শনার্থীরা দড়ি ধরে রথ টানায় যুক্ত হন, নাম সংকীর্তনে মুখর হয় পরিবেশ, প্রায় দু'শো গজ চওড়া ও একমাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জগন্নাথদেব ভগিনী সুভদ্রা ও দাদা বলভদ্রকে নিয়ে মাসির বাড়ি গুণ্ডিচায় উপস্থিত হন। মাসির বড়ো আনন্দ জগন্নাথ দর্শনে, তাই মাসির বাড়িতে জগন্নাথদেবের ভালই আদর, আপ্যায়ন জোটে। জ্বরের পর পঞ্চাশ ব্যঞ্জনযুক্ত খাবার খেয়ে জগন্নাথদেবের তো মহাস্ফূর্তি, তাঁর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না।

এদিকে বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের লক্ষ্মীদেবী চিন্তায় পড়েন। ভাবেন, মাসির বাড়ি গিয়ে অন্য কোনো রমণীর প্রেমে পড়লেন বুঝি। তাই থাকতে না পেরে তিনি সশরীরে হাজির হন সরষে পোড়া দিয়ে জগন্নাথদেবের নজর দোষ কাটানোর জন্য।

কিন্তু তাতে ও তো কাজ হলো না। তা হলে ননীচোরা কি মাসির বাড়িতে গিয়ে ভালোরকম খেয়ে ভুলে গেছেন লক্ষ্মীদেবীকে। খাবারে এত লোভ! তখন তিনি ভাণ্ডার লুঠ করার জন্য ছেলেদের পাঠান। ছেলেরা মাসির বাড়ি গিয়ে খাদ্য লুঠ করে ভাঁড়ার ঘর শূন্য করে দেয়। উল্টোরথের আগের দিন ভাণ্ডার লুটের ঘটনা ঘটে, জানান মঠের প্রধান সেবায়েত কল্যাণ মহারাজ। জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাওয়ার প্রথা হিসাবে ভাণ্ডার লুঠ ঐতিহ্য বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই উপলক্ষে প্রচুর

গুপ্তিপাড়ার মঠের মন্দির।

দর্শনার্থীর সমাবেশ ঘটে। ভাণ্ডার লুঠ কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমানসে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় যার ফলে স্থানীয় স্কুল বন্ধ থাকে। রথযাত্রা, রথমেলা বহু জায়গাতেই হয়, কিন্তু 'ভাণ্ডার লুঠ' হয় কেবল গুপ্তিপাড়াতেই। ভাণ্ডার লুঠের পরদিন জগন্নাথদেবের রথ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে মাসির বাড়ি থেকে ফিরে আসে। মেলা উপলক্ষে মন্দির থেকে দু' কিলোমিটার রাস্তা সেজে ওঠে। বেহুলা রেলগেট পার হয়ে 'শিল্পী' সিনেমা হলের পর থেকেই ছোট বড় মাঝারি নানা রকম দোকান বসে যায়। পশ্চিমে মনসাতলা পর্যন্ত বড়ো বড়ো দোকান জায়গা করে নেয়। রাস্তার দু'ধার ছাড়া বিরাট মেলা প্রাঙ্গণে, জগন্নাথদেবের আসা-যাওয়ার পথের দু' পাশে বসে হরেক কিসিমের দোকান। আসে পুতুল নাচ, থাকে অনেক দোলনা। মনিহারি ও খাবারের দোকান তো উল্টোরথের পরেও কিছুদিনের জন্য থেকে যায়। যাত্রী সমাগম, বেচাকেনায় গুপ্তিপাড়ার মেলা অন্যান্য মেলার মতো হলেও এখানে কিছু বিশেষত্ব আছে। এখানে প্রচুর কাঁঠালের আমদানি হয়, সেই সঙ্গে বস্তা বস্তা মুড়ি বিক্রি হয়। কাঁঠাল ভেঙে মুড়ি দিয়ে খাওয়া এখানকার রথযাত্রীদের দস্তুর আছে। এছাড়া আসে মালদার ফজলি আম, থাকে সিঙ্গাপুরী কলা, আনারস। এছাড়া আইসক্রীম, ফুচকা, কুলপি এসব তো থাকেই, সেই সঙ্গে থাকে রথ উপলক্ষে স্পেশাল সাইজের জিলিপি। বিক্রি হয় কাঠের, লোহার প্রয়োজনীয় জিনিস, ফুলগাছের চারা, ফলগাছের কলম। ঐতিহ্যের এই রথযাত্রায় শোনা যায়, একবার নবাব আলিবর্দি খাঁ-ও এসেছিলেন। মঠের অবস্থা খারাপ থাকায়, বহু টাকার খাজনা বাকি পড়ে। ফলে নবাবের কর্মচারীরা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে শমন পাঠান, তাঁরা ভেবেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম। এতে, তৎকালীন মোহান্ত মঠের আরাধ্য কৃষ্ণচন্দ্রের মূর্তি কোলে নিয়ে নবাবের দরবারে হাজির। এই ঘটনায় নবাবের কর্মচারীদের ভুল ভাঙে। নবাব মঠের সব খাজনা মকুব করে দেন। এর পর তিনি রথযাত্রা দেখতে গুপ্তিপাড়া আসেন।

একবার, রানী রাসমণিও গুপ্তবৃন্দাবন গুপ্তিপাড়ার রথ দেখতে এসেছিলেন। উল্টোরথ পর্যন্ত তিনি মঠে অবস্থান করেছিলেন।

ঐতিহ্য, আড়ম্বর সব মিলে গুপ্তিপাড়ার রথের মেলা শুধু হুগলী জেলার মধ্যে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মেলার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম।

নবাঙ্কুর

চিরদিনের গল্প

ভস্মাসুরের কাণ্ড

কৌশিক গুহ

ছোটোরা শুনতে চেয়েছিল অসুরের গল্প। কিংবা ভূতের গল্প। অজয়- স্যার ভূতের গল্প শোনাতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'ক্লাসের পড়াটা চটপট শেষ করতে পারলে গল্প বলবো।' গল্প শোনার উৎসাহ সকলেরই। ক্লাসের পড়া হলো মন দিয়েই। এরপরই তো গল্প শোনা। অজয়-স্যার খুব সুন্দর করে গল্প বলেন। ক্লাস শুদ্ধ সকলে একেবারে হাঁ করে শোনে। একটা শব্দও বাদ যায় না। দুষ্টু অন্যমনস্ক ছেলেরাও তখন একেবারে মনোযোগী। অজয়-স্যার গল্প শুনিয়ে পড়া আদায় করে নিতে জানেন। স্কুলের আর কোনো স্যার ওইরকম পারেন না— এটা সুতপনরা জানে।

অজয়-স্যার বলতে শুরু করলেন। 'ভস্মাসুর নামে এক অসুর ছিল। তার গায়ে খুব জোর থাকলেও বুদ্ধি তেমন ছিল না। তার ইচ্ছে হলো জোরদার ধ্যান করবে। উদ্দেশ্য একটাই ধ্যান করে শিবকে খুশি করা। শিব খুশি হলে একটা কোনো বর দিতে চাইবেন। তখন এমন কিছু চেয়ে নিতে হবে যাতে তার দাপট যথেষ্ট বাড়ে।

ধ্যানে কেটে গেলো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এক পাহাড়ের মধ্যে ধ্যান চলল। ধ্যানের সময় খিদে তেষ্টা কিছু থাকে না। একমনে ভস্মাসুর শিবকে ডেকে চলেছে। শিবকে বলা হয় অল্পে তুষ্ট দেবতা। তিনি খুশি হলে অনেক ভালো কাজ হবে। আর রেগে গেলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। অসুররা অনেকেই কঠোর তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে বর পেয়েছে। ভস্মাসুর ভাবল সেও ওইরকম করবে। অসুর তো—গায়ে ক্ষমতা বেশি, জেদও যথেষ্ট।

একজন ভক্ত দিনের পর দিন তাঁর দেখা পাবার জন্যে ধ্যান করছে— এটা জানতে পেরে শিব দেরি না করে হাজির হলেন। ভক্তের ধ্যান ভাঙিয়ে বললেন, 'আমি এসেছি। তুমি অত ভক্তিভরে আমায় ডেকেছো, না সাড়া দিয়ে পারি! এবার বলো তুমি কি চাও? যা চাইবে তাই-ই পাবে।'

ভস্মাসুর ধ্যান করলে কি হবে, তার তো মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ঠাসা। সে বলল, 'প্রভু, আমাকে এমন বর দিন আমি যার মাথায় হাত দেবো সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' শিব একটুও দ্বিধা না রেখে বললেন, 'তাই হবে।'

ভস্মাসুর তখন বলল, 'আপনি তো বর দিলেন। আমাকে যাচাই করতে দিন বর ঠিক আছে কিনা। আমার সামনে আপনি আছেন আপনার মাথায় হাত দিয়ে দেখি কি হয়।'

শিব দেখলেন এতো ভয়ঙ্কর বিপদ। দৌড় দিলেন শিব। পিছনে ভস্মাসুরও দৌড়চ্ছে। 'শিবকে ওইভাবে দৌড়তে দেখে ব্রহ্মা ভয় পেয়ে গেলেন। অন্য দেবতারাও। বিষ্ণু সব শুনে বললেন, 'দাঁড়ান, আমি দেখছি। সামলাচ্ছি অসুরকে।'

বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে ভস্মাসুরের আসার পথে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণকে দেখে বলল, 'শিব কোথায় গেলেন! আমাকে বর দিয়েছেন। অথচ তা পরীক্ষা করতে না দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি তো ধরবোই তাঁকে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'খুব ভালো কথা। কিন্তু আপনি শক্তিমান অসুর। ওইভাবে না দৌড়ে খুব সহজেই তো শিবের দেওয়া বর যাচাই করতে পারতেন?' ভস্মাসুর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'কীভাবে সেটা সম্ভব?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'খুব সহজ কাজ। আপনি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখুন।' ভস্মাসুর বলল, 'ঠিকই তো। এটাই আমার মাথায় আসেনি!' ব্রাহ্মণ চুপ করে রইলেন। ভস্মাসুর দাঁড়িয়ে পড়ে দু' হাত ঝাঁকিয়ে নিজের মাথায় রাখল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনে পুড়তে লাগল ভস্মাসুর। শিব স্বস্তি পেলেন। অন্য দেবতারাও। বিষ্ণু বললেন শিবকে, 'যাক, অল্পের জন্যে সব রক্ষা পেলো। এরপর বর দেওয়ার সময় একটু ভেবেচিন্তে দেবেন।' শিব বললেন, 'আমি তো ভেবেচিন্তে কিছু করতে পারি না।' বিষ্ণু হেসে বললেন, 'আপনি বিভ্রাট বাধালে আমাদেরই সামলাতে হবে।'

গল্প শুনে ক্লাসের প্রত্যেকে খুশি।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বইকে বন্ধু করে নেওয়া

'বই কিনে কেউ ঠকে না। বই বেচে কাউকে ঠকানো যায় না— একথা আমরা বলি। ব্যবহারের সময়সীমা নেই শুধু বইয়ের ক্ষেত্রে। কোনো বই সারাজীবনের সঙ্গী। কোনো কৃতীমানুষ অস্বীকার করেন না বইয়ের কাছে ঋণ। তাই ক্রমাগত বই কথা কই।' কথাগুলো প্রণবকাকু লিখে রেখেছে বইয়ের আলমারির সামনে। হয়তো নিজেকে সচেতন রাখার জন্যেই লেখা। একধরনের কথা মাঝেমধ্যে দেখা যায়। সপ্তর্ষি জানে প্রণবকাকু প্রচুর বই সংগ্রহ করে আর পড়ে। রোজই কিছু-না-কিছু পড়ে। পড়তে শিখুক না শিখুক ছোটোরা বই হাতে নিক— এটা চায় প্রণব। সেজন্যে সে প্রচার চালায়। লোকজনকে বলে। কেউ শোনে কেউ শোনে না। বই নিয়ে কথা তবু বলার শেষ নেই। কথাগুলো নেতাদের মতো হাওয়া ভরা বেলুনের মতো নয়। প্রণব নিজে পড়ে প্রচুর। এলোমেলো পড়া নয়। কোনো-না-কোনো বিষয় ধরে তার পড়াশোনা। সে বলে, 'জীবনে সময় খুব কম। আর জ্ঞান ভাণ্ডার বিপুল। একটা কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে কিছু কাজ হতে পারে।'

ছোটোদের পড়ার আগ্রহকে উসকে দেয়। বইয়ের মধ্যে যে মজাটা রয়েছে সেটা ছোটোরা একবার পেলে তারা বইকে আঁকড়ে ধরবে। ছোটোদের পড়ার ব্যাপারটা হবে খেলার ছলে। তারা একটু পড়ার পর খেলবে আঁকবে কিংবা অন্য কিছু করবে। শুধু দুষ্টুমি মারামারি ঝগড়া না করলেই হলো। ছোটোরা একসঙ্গে জড়ো হলে বেশ লাগে দেখতে। তারা উৎসাহও পায় পড়ায়। কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়। জোরজবরদস্তি বকাঝকা নয়। শুধু মজা আর আনন্দ। বইকে ভয় পাওয়া নয়। বইকে ভালোবাসা। পরিবেশ ঠিক করলেই সেটা হবে। অনেক গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে বইকে ভালোবাসে। যত্নে রাখে। আবার পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলেমেয়েরা বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। প্রণব জানে ওসব ব্যাপার জোর করে হয় না। এর মধ্যে লোকদেখানো কোনো ব্যাপার নেই। ছাপা শব্দগুলোকে কেউ এড়িয়ে যাবে। আর কেউ তার মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পাবে। যারা বইকে এড়িয়ে যাচ্ছে, পড়তে চাইছে না তাদের অন্যভাবে টেনে আনতে হবে। পাঠকরা তৈরি হয় দিনে দিনে। একসময় বোঝে পড়ার মতো জিনিস নেই। আমরা কেউ কিছু জানি না জীবনের শুরুতে। তারপর একটু একটু করে শেখা। শিখতে গেলে পরিশ্রম হবে। প্রথমদিকে খারাপ লাগবে। পরে মনে হবে পড়ার জন্যে খাটুনির মূল্য অনেক। প্রণব কথাগুলো নানাভাবে বোঝায়। যে ছোট্ট ছেলেটি বা মেয়েটি প্রথম দিকে উল্টো করে বই ধরে, সে একসময় বই ঠিকমতো ধরে নিজে নিজে পড়ে। তা দেখে প্রণবের মন ভরে যায়। প্রতি বছর কত নতুন পাঠক তৈরি হচ্ছে। বইকে তারা আঁকড়ে ধরছে, বন্ধু করে নিচ্ছে। প্রণব বলে, 'আমার কাজ ওদের আগ্রহটা ধরে রাখা। যে পড়তে শিখল তাকে নিয়মিত নতুন নতুন বই দেওয়া।' ছোটোরা প্রণবকাকুকে বন্ধু ভাবায় কাজ সহজ হয়েছে।

বইমিত্র

গরমের দিনের ছবি

অঙ্গনা

বিজ্ঞাপনে ‘মা’ আজ হারিয়ে গেছে

স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে বিজ্ঞাপনের প্রবেশ প্রায় ৭০-৮০ বছর আগে ঘটেছিল। তখন বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র বড় বড় সংবাদপত্রেই দেওয়া হতো। এরপর প্রবেশ ঘটে রেডিওতে এবং সব শেষে টিভিতে। অতএব বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে ভারতের পরিচয় নতুন না হলেও টিভির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভারতের পরিচয় হয় গত শতকের ৮০-র দশকের মাঝামাঝি। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় টিভিতে ‘হামলোগ’ এবং ‘বুনিয়াদ’-এর মাধ্যমে যে টিভি সিরিয়ালের সূচনা হয়। তারই হাত ধরে ভারতীয় টিভির জগতে বিজ্ঞাপনের প্রবেশ ঘটে।

আজকের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সেদিনের বিজ্ঞাপনের অনেক তফাত। যার অনেকটা অংশ জুড়েই থাকত ‘মা’। কিন্তু যা বিজ্ঞাপন দেখানো হতো তার মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশই ‘মা-সন্তান’কে কেন্দ্র করে দেখানো হোত। অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মায়েরাই তখন টিভিতে প্রতিনিধিত্ব করতেন। সালটা সম্ভবত ৮৩-৮৪, টিভির বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে যে কটা খুব জনপ্রিয় ছিল তার একটি ছিল এরকম— একজন খুব সাধারণ পরিবারের মা তার বাড়ির বারান্দায় বসে তার শিশু-সন্তানকে কাজল পরাতে পরাতে গান গাইছেন, ‘চন্দা রে তু মেরা সুরজ হ্যায় তু...।’ আরও একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন ছিল এরকম। এক উচ্চবিত্ত পরিবারের মা তার দুই সন্তানের হাতে কমপ্ল্যানের কাপ তুলে দিচ্ছেন। ভাইবোন দু'টি এক চুমুকে কমপ্ল্যান শেষ করে মা'কে বলছে, ‘আই অ্যাম এ কমপ্ল্যান বয়, আই অ্যাম এ কমপ্ল্যান গার্ল।’ সে সময় লোকের মুখে মুখে এই বিজ্ঞাপনের এই ক্যাপশনটি ঘুরে বেড়াত। আর একটি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ছিল বাজাজ স্কুটারের যার দৃশ্যটি ছিল এরকম— এক অল্প বয়সী যুবক সদ্য চাকরি পেয়ে বাজারের একটি স্কুটার কিনেছে। প্রথমদিন সেটিকে চালিয়ে সে অফিস যেতে চলেছে। চালানোর আগে তার মা স্কুটারটিকে পরিবারের সদস্যরূপে বরণ করে নিচ্ছেন নারকেল ফাটিয়ে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে যুবকটির বাবা ও ছোট বোন। এর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি গান হতো, ‘...হামারা কাল, হামারা আজ, বুলন্দ ভারত কী বুলন্দ তসবীর, হামারা বাজাজ।’ এক কথায় বলতে গেলে বিজ্ঞাপনটি ছিল অসাধারণ। সেখানে একজন মা একটি নির্জীব বস্তুকেও স্নেহ, মমতা ভালোবাসা দিয়ে নিজের সন্তানের মতো আপন করে নিচ্ছেন। এতো মাত্র তিনটে বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের উদাহরণ দেওয়া হলো। এরকম অসংখ্য বিজ্ঞাপন সে সময় টিভিতে দেখানো হতো যার মূল ভিত্তিই ছিল ‘মা’। মায়ের স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা— সবকিছুই যেন বিজ্ঞাপনের মধ্যেও অনুভব করা যেত।

৯০-দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের চেহারা প্রায় একইরকম ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের হাত ধরে ভারতবর্ষে ‘গ্লোবাল জি’ রিফরমস্ চালু হলো। সেদিন থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিজ্ঞাপন জগতেও পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লাগল, পাল্টে গেল বিজ্ঞাপনের চেহারা। ভারতীয় টিভিতে চলে এল পাশ্চাত্যের দখলদারি। ফল, ফুল-প্রজাপতি, শুদ্ধ দুধ, গ্রামীণ ভারত, সুন্দর শৈশবের স্থান নিয়ে নিল যন্ত্রপাতি, দামি গাড়ি, ফ্ল্যাট, পারফিউম, ত্বক, চুল, দামি শ্যাম্পু, সাবান বা ফর্সা হওয়ার ক্রিম প্রভৃতি। আর মায়ের স্থানে এসে গেল অনাবৃত নারী শরীর বা ‘মডেল’, ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ছাঁচটাই বদলে গেল, বিজ্ঞাপন হয়ে উঠল দৃষ্টিকটু। যতদিন গেল অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই অশ্লীল থেকে অশ্লীলতর হতে লাগল। বিজ্ঞাপন হয়ে উঠল এক বিকৃতরুচির নিদর্শন।

ইদানীং কিছু বিজ্ঞাপন দেখানো হয় যেখানে হরলিক্স, কমপ্ল্যান, বর্নভিটা, লাইফবয়, গুডনাইট, ম্যাগী, আইসক্রিম, কেলগস্ ইত্যাদি যার মধ্যে মা-শিশু বা মা-সন্তান থাকে। সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয়, ভারতীয় বিজ্ঞাপন জগতে ‘মা’ এখনো রয়েছে। কিন্তু খুব বিচক্ষণভাবে এই বিজ্ঞাপনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই মায়েরা ঠিক সেই মায়েদের মতো নয় যাদের আমরা ৮০ বা ৯০-র দশকে খুঁজে পেতাম। ইদানীং টিভিতে যে ‘মা’-কে দেখানো হয় সেই ‘মা’ জিনস্-টপ পরিহিতা। সেই মা ভারতের সকল শ্রেণীর ‘মা’য়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমাদের দেশটা যেহেতু ভারত, এই দেশটার সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মতো খেলো নয়, এই দেশের আপামর মানুষের মনে মায়ের রূপ অন্যরকম ভাবে আঁকা, সেজন্য এই জিনস্ পরিহিতা কসমোপলিটন আধুনিক মা বিজ্ঞাপন জগতে বেমানান। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনতো আবার এমনই, সেখানে মায়ের আর শিশুর পোশাকের খুব বেশি ফারাক থাকে না। শিশু হাফপ্যান্ট পরে জলে দৌড়চ্ছে, মাও হাফ প্যান্ট পরে জলে দৌড়চ্ছে। এই বিজ্ঞাপন শুধু লজ্জারই নয়, হাস্যকরও বটে। এই মায়েরা কারা? এরা কাদের মা? এই মায়েরা মাত্র ১ শতাংশ ভারতীয় সন্তানের মা যারা অর্থাৎ যেই শিশুরা ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি ত্যাগ করা বিত্তশালী পরিবারে সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে। এই মায়েরা সকলের মা হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এই আধুনিক বিজ্ঞাপনে মায়েরা থাকলেও সত্যিকার মায়ের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করতে পারছে না।

ভারতীয় বিজ্ঞাপন থেকে আজ ‘মা’ হারিয়ে যাচ্ছে। মায়ের স্থান দখল করছে ‘মম’ রা। এই ‘মম’ রা একটি বিশেষ শ্রেণীর ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানদের মা, ভারতীয় মা নয়। যে মাতৃমূর্তি আমাদের ভারতবাসীর মনে গাঁথা আছে বা থাকে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এই মা যেন কোনো বিদেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আমাদের নিজের মাকে হটিয়ে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন আমাদের মতো কবে হবে? মেনে চলতে হবে তাকে দেশের সংস্কৃতি। আধুনিকতা নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে না কিন্তু মনে রাখতে হবে আধুনিকতা যেন অশ্লীলতায় পরিণত না হয়, তা যেন সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে না যায় আমরা বিজ্ঞাপনে চিরন্তন ‘মা’কে ফিরে পেতে চাই, ‘মম’দের নয়।

অতিথি কলম

সঙ্ঘ এবং ব্যক্তিপূজা

মাধব গোবিন্দ বৈদ্য

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বাইরে থেকে বুঝে ওঠা সহজ কাজ নয়। এর মূল কারণ হলো সঙ্ঘ বর্তমানে প্রচলিত কোনো রাজনৈতিক দল অথবা কোনো সামাজিক সংস্থা বা সংগঠনের ধাঁচার মতো নয়। কিছু লোক মনে করেন সঙ্ঘে একনায়কতন্ত্র পদ্ধতিতে কাজ চলে, আবার কিছু লোক মনে করেন সঙ্ঘে ব্যক্তিপূজা বিদ্যমান। এই দুটি ধারণা একেবারে সত্য নয়।

ব্যক্তিপূজা নয়

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এমন এক কার্যশৈলী নির্মাণ করেছেন যা ব্যক্তিপূজা থেকে শত মাইল দূরে। সঙ্ঘ কোনোভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। হিন্দু পরম্পরা অনুসারে সঙ্ঘে গুরুর স্থান আছে। আর এই গুরু হলেন পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ। এই ধ্বজ ত্যাগ, পবিত্রতা ও শৌর্যের পরিচায়ক।

তাঁর সামনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বছরে একবার নিজের সাধ্য অনুসারে গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করেন। কে কত সমর্পণ করবেন এই প্রশ্ন সেখানে গৌণ। কোনো ব্যক্তির গুণগান করার কোনো পদ্ধতিই সঙ্ঘে নেই। শাখায় প্রতিদিনের প্রার্থনার পর স্বয়ংসেবকরা যে জয়ধ্বনি করেন তা হলো— 'ভারতমাতা কী জয়'।

অনুশাসনের রহস্য

সঙ্ঘের ভিতরের অনুশাসন দেখে লোকেরা প্রায়ই অবাক হয়ে যান। যখন আমি সঙ্ঘের প্রবক্তারূপে দিল্লীতে ছিলাম তখন এক বিদেশী সাংবাদিক সঙ্ঘের অনুশাসনের রহস্যের বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি এক মুহূর্ত ভেবে উত্তর দিই যে, এর কারণ হতে পারে সঙ্ঘে অনুশাসন ভঙ্গ করার পর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকা। আমি জানি না আমার এই উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কীনা, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি। আমার নিজেরও এই উত্তর দেওয়ায় অবাক লেগেছিল। কেউ কি শুনেছেন যে সঙ্ঘের ৮৫ বছরেরও বেশি ইতিহাসে কারো বিরুদ্ধে অনুশাসন ভঙ্গ করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? কোনো স্বয়ংসেবক কখনো অনুশাসন ভঙ্গই করেননি, এরকম কল্পনা করতে পারি কি?

অংশ ও সম্পূর্ণ

সঙ্ঘের বিষয়ে এক মূলভূত সত্য হলো সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন। 'অংশ' ও 'সম্পূর্ণ'--- এই দুটি শব্দের অর্থ খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে। সমাজের মধ্যে কোনো শ্রেণী বিশেষ বা গোষ্ঠীর সংগঠন করার জন্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়নি। সমাজের এক মিশ্ররূপ থাকে। সমাজজীবনের অনেক গতিবিধির মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয়। রাজনীতি এরকমই একটি ক্ষেত্র, কিন্তু একমাত্র নয়। শিক্ষা, কৃষি, ব্যবসা, শিল্প, ধর্ম এবং এরকম সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে যার মাধ্যমে সমাজ নিজেকে অভিব্যক্ত করে। সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন অর্থাৎ সমাজ জীবনের এইসব ক্ষেত্রগুলির সংগঠন। এজন্য স্বয়ংসেবকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সঙ্ঘ অনুমতি

দিয়েছে। প্রথম, ছাত্রদের জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তৈরি হয়েছে। রাজনীতি ক্ষেত্রের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দেখা করে সঙ্ঘের কার্যকর্তা চান। সেই সময় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, নানাজী দেশমুখ, সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, কুশাভাই ঠাকরে প্রমুখ কার্যকর্তাকে জনসঙ্ঘের কাজের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সহায়তা করার জন্য দেওয়া হয়। সঙ্ঘের অন্যতম এক প্রচারক দত্তোপন্ত ঠেংড়ীকে শ্রমিক ক্ষেত্রে কাজের জন্য পাঠানো হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে শ্রীগুরুজী নিজেই এগিয়ে এসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু নিজে তার অধ্যক্ষ হননি। সমাজের উত্থানের জন্য কোথাও কেউ সেবা কাজ শুরু করেছেন, সেখানেও কার্যকর্তা দেওয়া হয়েছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এরকম একটি প্রকল্প।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, রাজনীতি যদিও সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তথাপি সব কিছু নয়। এজন্য সঙ্ঘের তুলনা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে হতে পারে না। সঙ্ঘের সবসময় আগ্রহ থাকে যে, আমরা এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত এবং স্বয়ংসেবক যে কোনো ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় আমরা সেই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তাকেই মহিমান্বিত করার জন্যই কাজ করে চলেছি। এই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তার নাম হিন্দু।

ধর্ম ও 'রিলিজিয়ন'

ইসলাম বা খৃস্টানের মতো হিন্দু 'রিলিজিয়ন' নয়। ড. রাধাকৃষ্ণানও বলেছেন, ''হিন্দু রিলিজিয়ন নয়, অনেক রিলিজিয়নের সম্মিলিত রূপ।'' আমি এর সঙ্গে জুড়তে চাই 'হিন্দু' ধর্মের নাম এবং ধর্মের ব্যাখ্যা ব্যাপক। ইংরেজিতে ধর্মের কোনো প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু আমাদের জানা উচিত ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ রিলিজিয়ন নয়। রিলিজিয়ন ধর্মের একটি অংশমাত্র। আমাদের ভাষায় কিছু শব্দ আছে, যেমন— ধর্মশালা। ধর্মশালার ইংরেজি প্রতিশব্দ রিলিজিয়নস্ স্কুল কি? ধর্ম কাঁটার ইংরেজি রিলিজিয়ন ওজন করার দাঁড়িপাল্লা কি? তা নয়। এই ধর্ম আমাদের সংস্কৃতির আধার। সংস্কৃতি আমাদের মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের লক্ষণ হলো— শ্রদ্ধা, ভাবনা, বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যকে সম্মান জানানো। সুতরাং হিন্দুত্ব বিরাট ও বিশাল এবং সমস্তরকম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দেয়।

স্বাধীন ও স্বশাসিত

আলোচনার জন্য আমি একটু বিস্তারে গিয়েছি। আমাদের সমাজ জীবনের বিবিধতার বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে যে ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়েছেন সেগুলি স্বাধীন ও স্বশাসিত। তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা, আর্থিক দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আলাদা আলাদা পদ্ধতি এবং কাজ করার শৈলীও আলাদা। এসবে সঙ্ঘ কখনো হস্তক্ষেপ করে না কিন্তু চাইলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তারা বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও নিজের সংগঠনের বিবরণও সেখানে দেন।

বিতর্কিত প্রশ্ন

শ্রীহরতোষ সিংহ বল এক বিতর্কিত প্রশ্ন খাড়া করেছেন, যে প্রকারে নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিপূজা করা হলো তা সঙ্ঘ কীভাবে মেনে নিল? তাঁকে আমার উত্তর—নির্বাচন এক বিশেষ কার্যক্রম। ভোটদাতাদের আকর্ষণ করার জন্য কোনো এক প্রতীকের প্রয়োজন পড়ে। নরেন্দ্র মোদী তা পূরণ করেছেন। এই প্রতীক লাভদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠিত লোক বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। তাতে প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ভি.কে. সিংহ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক এম জে আকবর ও এরকম অনেকে আছেন। এর জন্য কাউকে শ্রেয় দেওয়া হয় তো নরেন্দ্র মোদীকেই দিতে হবে। কিন্তু আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, নরেন্দ্র মোদী এই প্রতীকাত্মক মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন আছেন। তিনি সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন, সঙ্ঘ-সংস্কৃতির মূলভূত জ্ঞান তাঁর আছে এবং এ বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞও বটে। তিনি প্রতিভাবান নেতা এবং চিরন্তন, যুগানুকূল ও আপদ্ধর্ম কি? ও এগুলির মধ্যে পার্থক্য কেমন? —এই বোধ তাঁর আছে।

পরিশিষ্ট

ক্যারাভান মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আমাকে এক প্রশ্ন পাঠিয়েছেন তা হলো কোনো ব্যক্তিপূজা ছাড়াই অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতাপার্টি সেবার নির্বাচনে জিতেছিল, কিন্তু এবার নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার অভিযান চালানো হলো কেন? আমার উত্তর ছিল— ভোটারদের আকর্ষিত করার জন্য কোনো প্রতীকের প্রয়োজন হয়। সে সময় বাজপেয়ীজীকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে সামনে রাখা হয়েছিল। আদবানীজীকেও এরকমই করা হয়েছিল। বাজপেয়ীজীর লোকপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে তাঁর জন্য বিশেষ কোনো প্রয়াস করার প্রয়োজন পড়েনি। তিনি মোরারজী দেশাই মন্ত্রিসভার বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। লোকসভায় অনেক বছর বিপক্ষ নেতা এবং রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। মোদীজীর কার্যক্ষেত্র তখন পর্যন্ত গুজরাট-কেন্দ্রিকই ছিল। তিনি তখন পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপি নির্বাচন ঘোষণার আগে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করে। ক্যারাভানের সম্পাদকের সংকেত ছিল নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে শোরগোল পড়ার দিকে। কিন্তু এর জন্য দায়ী তো প্রচারমাধ্যমগুলি। এর অর্থ এই নয় যে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে ব্যক্তিপূজা চলেছে বা চলছে। আর এরকম কোনো প্রয়াসই হয়নি। সঙ্ঘ ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাস করে না। আদর্শের পূজা করে। ■

(লেখক আর এস এস-এর বরিষ্ঠ কার্যকর্তা)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

চা-শ্রমিকদের করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রিপোর্ট প্রকাশ করছে না শ্রমদপ্তর

বাসুদেব পাল ॥ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ, শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি ডেভেলাপমেন্ট (এস.জে.ডি.এ.) এবং সর্বশেষ উত্তরকন্যা (রাইটার্স বিল্ডিং-এর উত্তরবঙ্গ সংস্করণ)— কোনোটাই উত্তরবঙ্গের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অসহায়, আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ মানুষের মনে আশার আলো জ্বালানো তো দূরের কথা, দেখাতেও পারেনি।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের এক সমীক্ষায় (অপ্রকাশিত) উঠে এসেছে বলে শোনা যাচ্ছে। হয়ত বা ওই কারণেই শ্রমদপ্তর সমীক্ষার ফলাফল সর্বসমক্ষে জাহির করতে সাহস করেনি।

উত্তরবঙ্গের মূল জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনজাতি সমাজ এবং মূল বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক ও চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারীরা মনে করেন, সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁরা উন্নয়নের সুফল ও শিল্পায়ন থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন। এই ক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছে একের পর এক সরকার-প্রশাসন বিরোধী তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।

উত্তরবঙ্গে রয়েছে তিন 'T' বা চা (Tea), কাঠ (Timber) এবং ট্যুরিজম্ বা পর্যটন শিল্প। এর মধ্যে চা-উৎপাদন ও চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উত্তরবঙ্গবাসীদের এক বিরাট অংশ। এই চা বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে রয়ে গিয়েছেন একেবারে পিছনের সারিতে। নিয়মিত মজুরি-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে একরকম বঞ্চিত বললে অত্যুক্তি হয় না। তিন বছরের পরিবর্তনের সরকারের আমলেও তাদের জীবনে খুব একটা রকমফের হয়নি। উত্তরবঙ্গ এবং দিগন্তবিস্তৃত সবুজ গালিচা (চা-বাগান) পরস্পর সম্পৃক্ত। দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্সের অর্থনীতি মূলত চা-শিল্পে সমৃদ্ধ। নানান ভাষা, হরেক জাত-পাতের জনমানুষ, নানারকম উপাসনা পদ্ধতি ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে উত্তরবঙ্গে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশ ও নেতৃত্বে চা-বাগান এলাকার সার্বিক দিকগুলি নিয়ে সমীক্ষা হয়। ২৭৬টি চা-বাগানের মধ্যে ২৭৩টি বাগান এই সমীক্ষার অধীনে আসে। ২০১৩ সালের ১০ মে সমীক্ষা সমাপ্ত হয়ে শ্রমদপ্তরে রিপোর্ট জমা পড়লেও তা কোনও অজ্ঞাতকারণে সর্বসমক্ষে আসেনি। ওই সমীক্ষায় চা-বাগানের নয়নাভিরাম সবুজ গালিচার নীচে হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার চেহারার বাস্তব চিত্রটা চাপা রয়েছে যা মর্মপীড়াদায়ক।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য :

চা বাগান ও তার পরিচালন, চা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার উপস্থিতি ও কর্মপদ্ধতি, নতুন করে চারাগাছ লাগিয়ে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা, বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকা ও তাদের সার্বিক অবস্থার অধ্যয়ন, আর্থিক অবস্থা-সহ অন্যান্য সমস্যা কাটিয়ে বাগানগুলোর অস্তিত্বরক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা ছিল সমীক্ষার মূল বিষয়। আর এই সমীক্ষাতেই উঠে এসেছে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার করুণ অবস্থা। এখানেই একপ্রকার স্বীকার করা হয়েছে যে, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা-সহ অন্যান্য পরিষেবার দৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা দেশের অন্য এলাকার শ্রমিক, এমনকী দক্ষিণ ভারতের চা শ্রমিকদের থেকে অনেক পিছিয়ে। সমীক্ষা থেকে চা বাগানের মালিকানা, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি একাধিক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

ভারতের ১৯৫১ সালের 'প্লান্টেশন লেবার অ্যাক্ট' অনুসারে সকল চা-বাগান নিবন্ধনকৃত হওয়া আবশ্যিক। অথচ উত্তরবঙ্গের ৮৭টি চা বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা সার্টিফিকেট সমীক্ষকদের জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে, বাগানগুলো বেনামে চলছে অথবা বাগান-মালিকরা পরিচয় গোপন রেখে বাগানগুলো চালাচ্ছেন। পাঁচটি বাগান Tea Board of India প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখাতেই ব্যর্থ হয়েছে। ১১৪টি চা-বাগানের লীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে

১০৫টি বাগান লীজ পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করলেও লীজ নবীকরণ হয়নি। গত ১০ বছরে ১১৬টি চা বাগানের পরিচালক ও মালিকানার একাধিকবার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক প্রমোটার বর্তমানে ওই সকল বাগান পরিচালনা করছেন। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পিত উন্নয়ন ওই সব ক্ষেত্রে বা বাগানের হচ্ছে না।

সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে উত্তরবঙ্গের ১৭৫টি চা বাগানে কোনও লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারই নেই। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ২৪টি বাগান প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে এক টাকাও জমা করেনি। ২২টি বাগান গত চার বছরে গ্র্যাচুয়িটি খাতে কোনওরকম অর্থ জমা করেনি। আটটি চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতন বাকি, এছাড়া আরও ৩৫টি চা বাগানে শ্রমিকদের রেশনই বকেয়া থেকে গিয়েছে।

চা বাগানের শ্রমিকদের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, তাদের উন্নয়ন ও বাগানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায় বাগান কর্তৃপক্ষের। দেখা যাচ্ছে, সমীক্ষা অনুসারে বেশিরভাগ বাগান-ম্যানেজারদের পেশাগত কোনও ডিগ্রিই নেই। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। সুচারুরূপে বাগানের ব্যবস্থা ও কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে না। ১৮৮টি বাগানের ম্যানেজারের কেবলমাত্র স্নাতকডিগ্রি রয়েছে। ৩৫ জন ম্যানেজারের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও কোনও পেশাগত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নেই। কেবলমাত্র ৫৩টি বাগান ম্যানেজারের পেশাগত যোগ্যতা রয়েছে। প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী (১৯৫১) প্রত্যেকে চা-শ্রমিকের চা-বাগানে থাকার জন্য ঘর পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অথচ চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারী ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৬২ জন শ্রমিকের মধ্যে ৯৫ হাজার ৮৩৫ জন (৩৬ শতাংশ) শ্রমিক এখনও পর্যন্ত কোনও শ্রমিক কোয়ার্টার বা থাকার ঘর পাননি। পাহাড়ের তিনটি এবং ডুয়ার্সের তিনটি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটিও ঘর দেননি। ৫১টি চা-বাগান মোট শ্রমিকের প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিককে বসবাসের জন্য 'ঘর' দিতে পেরেছে। উপরি উল্লিখিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে ডুয়ার্সের ৩৭টি চা-বাগান শ্রমিকদের ঘর মেরামতের জন্য বিগত চার বছরে একটি টাকাও খরচ করেনি।

যে পাঁচটি চা-বাগানের মালিকানা নিয়ে জটিলতা বা অস্বচ্ছতা রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো বীরপাড়ার বান্দাপানি চা বাগান। প্রথমাবস্থায় বাগানটি 'ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লিমিটেড'-এর নামে ছিল। পরবর্তী সময়ে বাগানটি হাতবদল হয়ে 'আলিপুরদুয়ার এন্টারপ্রাইজ' নামক একটি সংস্থার হাতে চলে যায়। ২০০৬ সালের পর বাগানটির লীজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গেলেও আলিপুরদুয়ার এন্টারপ্রাইজ বাগানের লীজ নতুন করে নবীকরণ করায়নি। ওই পরিস্থিতিতে ২০১০ সালে 'সারদা প্লেজার্স অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স লিমিটেড'— নামে জনৈক রাকেশ শ্রীবাস্তব চা বাগানটি কিনে নেন। যদিও সরকারি নথিপত্রে বাগানটির লীজ আলিপুরদুয়ার এন্টারপ্রাইজ-এর নামেই রয়েছে। অথচ অদ্ভুতভাবে বাগানের মালিক হিসেবে রয়েছে রাকেশ শ্রীবাস্তবের নাম। সমীক্ষায় এমনতরো অনেক গোপন ও জগাখিচুড়ি তত্ত্ব ও তথ্য সামনে উঠে এসেছে।

যে সকল বাগান খোলা বা চালু অবস্থায় রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি এবং ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ ফুড ওয়ার্কার্স নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা উত্তরবঙ্গের চা-বাগান নিয়ে পৃথকভাবে একটি সমীক্ষা করেছিল। তাদের রিপোর্টে চা বাগান এলাকায় বসবাসরত শ্রমিকদেরকে 'স্টার্ভিং কমিউনিটি' বা অনাহারক্লিষ্ট সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কারণ হিসেবে উক্ত সংস্থার সমীক্ষায় এতদঞ্চলের চা-শ্রমিকদের অত্যন্ত কম পারিশ্রমিককেই দায়ী করা হয়েছে।

পূর্বতন কেন্দ্র সরকারের বহু আলোচিত একশো দিনের প্রকল্পে শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১৫১ টাকা, তখন চা-বাগানে কঠোর পরিশ্রমকারী একজন দক্ষ শ্রমিক পান মাত্র ৯৫ টাকা। ওদিকে দক্ষিণ ভারতের কেরলে একজন চা-বাগান শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ২২৫ টাকা, তামিলনাড়ুতে ২১০ টাকা। প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুসারে চা-শ্রমিকদের বেতন বাদেও শ্রমিকাবাস, চিকিৎসা পরিষেবা-সহ বেশকিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা। ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সরকারিভাবে চা-শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা করা হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে চা-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, বাগান মালিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মজুরি সংক্রান্ত আলোচনায় নির্ধারিত হাজিরাকেই ন্যূনতম মজুরি বলে ধরা হয়। শ্রমিকদের অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধার কথা বলে এতদঞ্চলের শ্রমিকদের অস্বাভাবিক কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। যেসকল অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয় তারও কতটা শ্রমিকদের জন্য সুবিধাজনক সেকথাটা কেউ খেয়াল করেন না।

সরকারি সমীক্ষায় অনেক সমস্যা যেমন উঠে এসেছে তেমনই সমাধানকল্পে বেশ কিছু প্রস্তাব উঠে এসেছে। উত্তরবঙ্গে চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারী চা-শ্রমিকদের বাদ দিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ২০১১-র মে মাসে নতুন সরকার আসার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে। চা-শ্রমিকদের অবস্থার কোনও হেরফের হয়নি। অথচ এর মধ্যে চায়ের দাম ট্রেনে ৫ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হয়েছে।

২০১৪ লোকসভা নির্বাচন ও চা-শ্রমিক :

এবারকার নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা বিভিন্ন জনসভায় Tea Board-এর পবিবর্তে পৃথক Tea Ministry গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চা বাগানকে কেন্দ্র করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিলিগুড়ির জনসভায়। তবে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে দলের প্রার্থী পরাজিত হলেও জয়লাভ করেছেন দার্জিলিং কেন্দ্রের প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়া। অভিজ্ঞ সাংসদ আলুওয়ালিয়াজী মন্ত্রী হননি। আলিপুরদুয়ার আসনে চা বাগানের ভোট জয়-পরাজয় নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে। ভোটভাগের সুবিধায় রাজ্যের শাসক দলের প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এখন রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সংসদে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কথা সবাই মিলে তুলে ধরলে পরিবর্তন হতে পারে। ■

মাও প্রভাবিত এলাকার মানুষের আশা পূরণে নকশাল দমনে কঠোর পদক্ষেপ মোদী সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ক্ষমতায় আসার দিনকয়েকের মধ্যেই দেশের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকার মানুষের আশাপূরণে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। প্রসঙ্গত, দু-একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র বাদে দেশের নকশাল-অধ্যুষিত লোকসভা আসনগুলির সিংহভাগই দখলে এসেছে বিজেপির (সংশ্লিষ্ট সারণী দ্রষ্টব্য)। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন মূলত মাও-দমনে বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, নীতির ক্ষেত্রে অপরিণামদর্শীতার কারণেই মাও বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড-সহ দেশের সাতটি রাজ্যের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে। যে কারণে মাও অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এবার নির্বাচনে ঢেলে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

মাও দমনে রমন সিং-এর নেতৃত্বাধীন ছত্তিশগড় সরকার কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের কাছে একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সহায়তার জন্য দরবার করলেও অধিকাংশ সময়ই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। গত ৯ জুন রমন সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর কাছে এ ব্যাপারে কিছু কয়েকটি দাবি পেশ করেন। কেন্দ্র ছত্তিশগড়ের জন্য বারো ব্যাটেলিয়ন সেনা মোতায়নের সঙ্গে অতিরিক্ত হেলিকপ্টার দেবার কথাও ঘোষণা করেছে।

বছরখানেক আগে ইউপিএ সরকার ছত্তিশগড়ের মাও-প্রভাবাধীন এলাকায় ৭৫টি পুলিশ থানার জন্য ১৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। কেন্দ্রের এহেন উদ্যোগের কারণ ছিল সেই সময় কংগ্রেস কর্মীদের ওপর মাও-হামলা। কিন্তু বছরখানেক বাদেও সেই থানাগুলির একটিও সম্পূর্ণ হয়নি। ৫৬টির কাজ এখনও চলছে, ১৫টির কাজ স্থান পরিবর্তন করা হবে বলে এখনও বিশ বাঁও জলে। যে থানাগুলির অস্তিত্ব রয়েছে তাদের অবস্থাও তথৈবচ। যেমন বীজাপুরের ভদ্রকালী থানাটি এমনই জায়গায় অবস্থিত যে যেতে গেলে নদী পার হতে হয়। আবার ফারসগড়ের থানাটি পর্ণকুটীরে পরিণত হয়েছে। এরই ফলে এবার নির্বাচনের সময় দু'টি বড়সড় মাও-হামলায় ঘটনা ঘটেছে। যাতে প্রাণহানি হয়েছে ২৩ জনের। বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার দ্রুত কাজ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও নকশাল দমনের যে নীতি নিয়েছে, তাতে এই তিনের মিশেলে এই হিংসা পরিস্থিতি এড়ানো যাবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশা।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু বেশ জটিল। গত মে মাসেই সিপিআই (মাওবাদী) শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে নকশালবাড়ির সিপিআই (এমন এল)-এর শীর্ষনেতারা মিলিত হন। প্রসঙ্গত, কেরলে ও কর্ণাটকে মাও-হিংসার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিগত ইউপিএ সরকার যে এ থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি পরবর্তী মাও-হামলার ঘটনা প্রবাহ থেকেই তা পরিষ্কার বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

কংগ্রেস সরকারের নীতিপঙ্গুত্ব ও ব্যর্থতার জোয়াল যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বইবে না তা নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতেই পরিষ্কার ছিল। তাছাড়া মাও-দমনে বিজেপি-র নীতি বরাবরই সুস্পষ্ট। মাও-কবলিত প্রান্তিক মানুষের মধ্যেও এবার সেই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি। তাই

সারণী

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশের মোট ২৬টি মাও অধ্যুষিত জেলায় ১৯টি কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল

রাজ্য	আসন সংখ্যা	বিজেপি-র জয়
ছত্তিশগড়	৩	৩
ঝাড়খণ্ড	৬	৬
বিহার	৩	২+১ (এল জে পি)
ওড়িশা	৩	০
অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ	২	১
মহারাষ্ট্র	১	১
পশ্চিমবঙ্গ	১	০

বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে সিপিআই (এম এল) নামক মাও- সংগঠনটিই। সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক মুপ্পালা লক্ষণ রাও ওরফে গণপতি এবং সিপিআই (এম এল)-এর নকশালবাড়ি সম্পাদক অজিত এর পর যৌথ বিজ্ঞপ্তি জারি করে--- 'পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশে মাও সংগঠনের বর্তমান বিস্তার প্রমাণ করছে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বলবেই'। গত ২২ জানুয়ারি মাও অধ্যুষিত রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তার বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সতর্ক করা হয়েছিল যে মাওনেতা গণপতির কিন্তু মাও আন্দোলনের বিভিন্ন কঠিন সময়ে সংগঠনকে নেতৃত্ব দেবার দেশের সাতটি রাজ্যের ২৬টি মাও অধ্যুষিত জেলার ১৯টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৪ টিতেই জয়লাভ করে বিজেপি। এর মধ্যে একটি অবশ্য পায় তাদের জোটসঙ্গী রামবিলাস পাসোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি। একমাত্র ওড়িশা আর কিছুটা পশ্চিমবঙ্গ বাদে বাকি পাঁচটি রাজ্যেই নকশাল কবলিত এলাকায় বিজেপি-র একাধিপত্য (সারণী দ্রষ্টব্য)। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে মাও প্রভাবিত এলাকার মানুষ মাওবাদীদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে মোদী সরকারের ওপর কতটা নির্ভরশীল হতে চাইছেন। ■

ভারত এখন এক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে

অমলেশ মিশ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লিখিত স্বদেশ (পৃ. ৭৭৫, ৪র্থ খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা) প্রবন্ধে বলেছেন—

‘‘অক্ষমতার প্রধান বিপদ হইল যে, সে বৃহৎ কাজ করিতে পারে না বলে বৃহৎ ভালকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে বড় মিথ্যার চেয়ে ছোট সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।’’

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধিতে যা বুঝেছিলেন, আমরা ভারতবাসী ১৯৪৭ থেকে অদ্যাবধি সেই কথাটা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি। সেই জহরলালের সময় থেকে এই ড. মনমোহন সিং পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা যত না বৃহৎ কাজ করেছেন তার থেকে অনেক বেশি বৃহৎ ভাল করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯৯৯-২০০৪) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি বৃহৎ ভাল করেননি। বৃহৎ কাজ করেছিলেন। একথা আমরা অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি ও দেখছি যে, কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে অক্ষমদের হাতে ক্ষমতা থাকায় বৃহৎ কাজ অপেক্ষা বৃহৎ ভাল গুরুত্ব পেয়েছে। এবং সেই ভাল নিয়ে বাগাড়ম্বরের শেষ নেই।

ভারত যদি ১৯৪৭ থেকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হত তবে ভারত বৃহৎ কাজই করত, বৃহৎ ভাল করত না।

দেশ এবং দেশবাসীকে খণ্ড খণ্ড করে নয়, অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিকাশের স্লোগান সেই দৃষ্টি দিতে পারে না। একজন আদর্শ জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে দেখলেই এই অখণ্ডতা দৃশ্যমান হবে।

রাষ্ট্র একটি দেহ। এর ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় এবং সুস্থ থাকলেই দেহটি সুস্থ থাকে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে এবং প্রত্যেকটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ। কোনটিকে অবহেলা করা যায় না। কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ বিকল হলে— তার পৃথক শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। তবে সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, তাকে তার স্বস্থানে রেখেই চিকিৎসা করতে হবে। সমস্ত দেহকে সুস্থ রাখার জন্য কোনটিকে হয়ত দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হতে পারে। তখন বিচ্ছিন্ন করাই শ্রেয়।

ভারতীয় সমাজ এবং দেশবাসীকে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা বহু খণ্ডে বিভক্ত করেছেন— তার কারণ হলো দেশকে অখণ্ড ভাবে দেখতে পারার অক্ষমতা। যে মানসিকতা এই অখণ্ড চিন্তার উদ্গাতা সেই মানসিকতার চর্চা আমাদের পারিবারিক সংস্কার ও বিদ্যার্চার কেন্দ্রগুলি থেকে অপসৃত হয়েছে।

যে কোনো রাষ্ট্রেই একটি সাধারণ ব্যবস্থা থাকে— যে ব্যবস্থাই ওই রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের জন্য। এবং সেই সাধারণ ব্যবস্থাটি সেই দেশের জাতীয়তাভিত্তিকই হয়ে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক। আরব দেশের ব্যবস্থাবলী অবশ্যই আরব জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একই ভাবে ফ্রান্স বা জাপান বা অন্য কোনও দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা।

ভারতের সমস্যা হলো--- এই জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করা অক্ষমতার কারণে। ভারতের রাষ্ট্রনায়করা হয়েছে বহু দেশের বহু বিষয় অনুকরণ করেন, কিন্তু যে ভাবনায় সেই দেশগুলি পরিচালিত হয়, সেই ভাবনাটা গ্রহণ করেন না। সেই ভাবনাটি হলো জাতীয়তাবাদের ভাবনা।

এতাবৎকাল আমরা দেখে আসছি যে ভারতের রাষ্ট্রনায়করা রাজনীতি চিন্তায় যতটা পটু, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় ততটাই অপটু। এঁরা রাজনীতির কারণে দেশের পাঁচ বছরের কথা ভাবেন, ৫০ বছরের কথা ভাবতে পারেন না। এই না পারার কারণও এঁদের অক্ষমতা। মানসিক অক্ষমতা।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম দলের একটি মুখপত্র আছে— যা প্রত্যহ সকালে প্রকাশিত হয়। আমি প্রত্যহ ওই মুখপত্রটি পাঠ করি। দেখেছি যে— নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের মধ্যে কতটা হিন্দুয়ানি আছে— তারই বিশ্লেষণ। এঁরা সম্পূর্ণ দেশটাকে দেখতে পান না। সমগ্র দেশবাসী এঁদের ধারণায় আসে না। দেশবাসীকে দু'ভাগে বা তারও বেশি ভাগে ভাগ করে এঁরা দেখেন। মানুষ এঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। মানুষ অখণ্ড ভারতকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন। ওঁরা পিছিয়ে পড়ছেন--- ওদের অক্ষমতায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে নরেন্দ্র মোদী হিন্দুত্ববাদী, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী দোষের হয় কী করে? হিন্দুত্ববাদ তো ভারতকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে না। আর ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদকে অস্বীকার করেই তো ওরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছেন। সারা দেশে ৫৪৩টি আসনে ওঁরা মাত্র ৯টি আসনে। ভোট ৩.৩ শতাংশ।

ভারতবর্ষকে জাগাতে গেলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করেই জাগাতে হবে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বভিত্তিক। হিন্দুত্ব বলেই এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ও জাতিতে হিন্দু--- সম্প্রদায়ে মুসলমান। মুসলমান জাতি বললে কিছু হয় না যদিও আরবজাতি বললে কিছু বাঝায়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— ‘‘আমি হিন্দু বললে হয়তো কারুর কাছে অপ্রিয় হতে পারি কিন্তু আমার নামের সঙ্গে এই অপ্রিয়তাজনিত বিদ্বেষটুকু বহন করতেই হবে। ‘আমি হিন্দু নই’ এই কথা বলে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস মূর্খামি। হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নয়, হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতিগত পরিণাম। জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়।’’

(আত্মপরিচয়। ১৩ শ খণ্ড। রবীন্দ্র রচনাবলী। শতবর্ষ সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।)

নরেন্দ্র মোদী একজন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়ক। ভারতকে জাগ্রত করার প্রথম পদক্ষেপ আশা করা যায় তিনিই নেবেন। ■

মাজুলী দ্বীপের মারাঠী শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ব্রহ্মপুত্রের বুকে পলি জমে জমে তৈরি হওয়া মাজুলী দ্বীপ। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম। এখানে দশ-বারোটি গ্রাম গড়ে ওঠেছে। চারিদিকে নারিকেল, সুপারির বাগান, বাঁশঝাড়, আর্কিডের ফুলে ভর্তি ও নীচুস্থানে ধানক্ষেত। বন্যার সময় লোকেরা ওঠে এসে উঁচু জায়গায় ঘর বানায়। বন্যা নেমে গেলে আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়। বাইরের কেউ এখানে এলে গ্রামবাসী খুবই ভাল ব্যবহার করে। মহারাষ্ট্র থেকে কেউ এলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন— রবি স্যারের রাজ্যের লোক? প্রায় সবাই একথা জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আদর আপ্যায়নে ভরিয়ে দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই আগন্তুকের মনে প্রশ্ন জাগে— এই রবি-স্যার কে? রবিস্যার ও মাজুলী দ্বীপের লোকের কাহিনী শোনার পর মনে হবে— এই সম্মান রবিস্যারের প্রাপ্যই বটে।

রবিস্যারের পুরো নাম রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ সাওদেকর। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার চান্দওয়ড গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ গুরুজীর একমাত্র পুত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে আচার্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রতিবছর শত শত উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতী সেবাধর্মের দীক্ষা নিয়ে দেশের অনুন্নত এলাকায় সেবাকাজ করার জন্য যায়। বিবেকানন্দ কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নাগাল্যান্ডের ডোয়াংগে সেবাকাজের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

একমাত্র সন্তান, তার ওপর একা এতদূর যাবে, হিংসাগ্রস্ত এলাকা— এসব ভেবে রবীন্দ্রনাথের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু সেবাধর্মে দীক্ষা নেওয়া রবীন্দ্রনাথ 'সেখানে গিয়ে একমাস দেখি' বলে ২০০০ সালে ঘর ছাড়েন। তারপর চোদ্দ বছর হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ এখন মাজুলী দ্বীপের রবিস্যার হয়ে গেছেন।

অতি দুর্গম ডোয়াংগ-এর মাজুলী দ্বীপে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ দেখেন সভ্যতার কণামাত্র সেখানে পৌঁছোয়নি। অনেক চেষ্টায় দ্বীপের কমলবাড়ি গ্রামে একটি পাঠশালা শুরু করেন। দ্বীপের লোকেরা স্থানীয় ভাষা ছাড়া কোনো ভাষা বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করে তাদের ভাষা শিখে নেন। জোরহাট থেকে দু'জন শিক্ষক নিয়ে এসে ৫৩ জন স্থানীয় ছেলে-মেয়েকে নিয়ে স্কুল চালাতে শুরু করেন। নতুন রাজ্য, নতুন পরিবেশ হওয়ার কারণে সমস্যাও দেখা দিয়েছিল কিন্তু স্থানীয় লোকের সহায়তায় তা সমাধানও করেন। ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে শুরু করায় রবীন্দ্রনাথ কমলাবাড়ির বাইরে একটি জায়গার খোঁজ করেন এবং পেয়েও যান। নীচু জায়গা ও বাঁশঝাড়ে ঘেরা, বর্ষার সময় জলে ভরে যায়। কিন্তু গ্রামবাসীর সহায়তায় নীচু জমি ভরাট করা হয়। গ্রামবাসীর ইচ্ছা স্কুল ইটের পাকাবাড়ি হোক। কিন্তু সেখানে ইট তৈরি হয় না, সিমেন্ট পাওয়া যায় না।

অন্য রকম

রবীন্দ্রনাথ 'মাজুলী হিতৈষী বন্ধু' নামে এক সংগঠন তৈরি করে তার সহায়তায় নদীপথে ১৫ ট্রাক পাথর এনে ভেঙে, জোরহাট থেকে সিমেন্ট এনে ২০০৪ সালে স্কুলের পাকাবাড়ি তৈরি হয়। মাজুলী দ্বীপের সব গ্রামের সব বাড়ির ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়তে আসে। আজ মাজুলী দ্বীপে নিরক্ষর কেউ নেই। কলেজে পড়ার জন্য দ্বীপের ছেলেমেয়েরা জোরহাট ও ডিব্রুগড়ে যেত। এখন মাজুলীতেই কলেজ তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যে রবিস্যার মহারাষ্ট্রের পূর্বাদেবীকে বিয়ে করেছেন। পূর্বাদেবীও মাজুলীতে এসে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনিও অসমের ভাষা থেকে সবকিছুই রপ্ত করে ফেলেছেন।

বর্ষার সময় ব্রহ্মপুত্রে বন্যা আসে। নীচু এলাকার বাড়িঘর ডুবে যায়। তখন রবিস্যার ও পূর্বাদেবী ছোট নৌকায় করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকেদের খোঁজখবর নেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন। ২০০৯ সালে প্রবল বন্যায় দ্বীপ ভেসে গিয়েছিল। সেই সময়ও রবিস্যার গ্রামেই থেকে সমস্ত লোকেদের খোঁজখবর রাখছিলেন।

আজ চৌদ্দ বছরে রবিস্যার অসমেরই একজন হয়ে গেছেন। নিজের গ্রামের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। তাঁর আনন্দ— মাজুলী দ্বীপের স্কুলে পড়াশুনা করে বড় হওয়া অনেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা রবিস্যার ও মাজুলী দ্বীপকে ভোলেনি। তাঁর নিজের কথায়— "সেবাধর্মের দীক্ষা নিয়ে আমি এসেছিলাম। কিন্তু আজ আমি গর্ব অনুভব করছি আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকে সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়ে আমার মতোই কাজ করছে। তাই আমি মনে করি আমার জীবন ধন্য।" ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

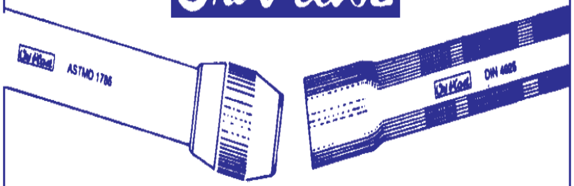

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"অতএব ভারতসন্তানগণের সঙ্কল্প হোক, পরিশ্রম করে জ্ঞানার্জন করা। সেই জ্ঞান তার নিজের উন্নতির জন্য নয় — কাজের জন্যই কাজ করা, সত্যের জন্যই জ্ঞানার্জন করা, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, বীরত্বপূর্ণ কাজ করবার জন্যই শক্তি অর্জন করা।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ভাল থাকার রহস্য

রমেশ চন্দ্র দাস

ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ বিধি বিধান মেনে না চলার ফলে অনেককে শারীরিক এবং মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। অপরিণত বয়সে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিনা চিনিতে চা খেতে হয়, আবার অন্যদিকে পেটে গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার ভয়ে বিনা দুধের চা খেতে হয়। ফলে চায়ের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমনকী ভয়ে ভয়ে আলুও খাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। বিশেষ করে ভোজ বাড়িতে এই সমস্ত রোগীর খাবারের পাতায় তরকারির আলু উচ্ছিষ্ট রূপে শোভা পায়। পরিবেশনে মিষ্টির ছড়াছড়ি হলে কী হবে, মিষ্টি খাওয়া বারণ থাকায় অতৃপ্ত অবস্থায় ভোজন সম্পন্ন করতে হয়।

অর্থের অপচয় সহ্য করে আর সকলের মতো বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকের পরামর্শে নির্ধারিত ঔষধ খেতে খেতে মুখের স্বাদ বিকৃত হয়। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের মতো প্রাণ খুলে হাসিও মুখে আসে না, কারণ শরীরে প্রবিষ্ট সেই মধুমেহ রোগ তার অবস্থানের কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়। শরীরের অসহায় অবস্থার সুযোগে হৃদয় রোগ, উচ্চ রক্তচাপ আদি শরীরে বিস্তার লাভ করে। এই সব রোগের একত্র সমন্বয়ে শরীর অবসন্ন হয়ে যায়, চলা-ফেরার শক্তি হ্রাস পায়, মানসিক স্থিতি বিঘ্নিত হয়। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও রোগাক্রান্ত অবস্থায় অবশেষে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে কোনো রকমে কালাতিপাত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

এই ভয়াবহ এবং রাজসিক মধুমেহ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র অবলম্বনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করা। মধুমেহ রোগকে সমূলে বিদায় দেওয়ার আগ্রহ থাকলে প্রথমে শরীর শুদ্ধক্রিয়ার অন্তর্গত কুঞ্জল বিধির প্রয়োগ আবশ্যক। হৃদয় এবং শ্বাসরোগী ছাড়া প্রাতঃকৃত্যের পর সামান্য লবণ মিশ্রিত জল (শীতকালে ঈষদুষ্ণ জল) কণ্ঠ অবধি সাধ্যানুসারে ৭।৮ গেলাস ক্রমশ বিনা বিরতিতে পান করতে হবে। তারপর অনতিবিলম্বে দুই পা এক করে কোমর ঝুঁকে বাঁ হাত দিয়ে নাভিতে চাপ সৃষ্টি করে ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা একত্রে মুখের ভেতরে জিহ্বামূলকে দাবাতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বমির প্রবণতা উৎপন্ন হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে জল অনর্গল বেরোতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পান করা জল নিষ্কাশনে শরীরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় দূষিত পদার্থ— পিত্ত, কফ আদির নিষ্কাশনে শরীর হাল্কা অনুভব হবে। এতে হৃদয় এবং শ্বাসনালিতে শক্তি উৎপন্ন হবে এবং অতিনিদ্রা ও শরীরের ক্লান্তি দূর হবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আসন যেমন পশ্চিমোত্তানাসন, যোগমুদ্রা, ধনুরাসন, ময়ূরাসন, হলাসন, গোমুখাসন খুবই উপযোগী হবে। তন্মধ্যে যোগমুদ্রা প্রথমত সহজ হবে বলে মনে করি। যোগমুদ্রার বিধি অনুসারে প্রথমে পদ্মাসন অথবা সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে মেরুদণ্ড এবং ঘাড় সোজা রেখে নেত্রদ্বয় কোমলতাপূর্বক বন্ধ রাখতে হবে। তৎপশ্চাৎ দুই হাত পিঠের উপর করে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জি শক্ত করে ধরতে হবে। বাঁ হাতের মুষ্ঠি বন্ধ করে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই মুষ্ঠির ভেতরে চেপে রাখতে হবে। তৎপশ্চাৎ সেই গৃহীত শ্বাসকে ছাড়তে ছাড়তে পেট একদম খালি করে মাথা ভূমিতে লাগাবার প্রয়াস করতে হবে। পূর্ণ স্থিতিতে শ্বাস সাধারণ রেখে কিছুক্ষণ সাধ্যানুসারে অবস্থানের পর শ্বাস নিতে নিতে পূর্ব স্থিতিতে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর পা দু'টো সামনে লম্বা করে, হাত দু'টো পেছনে মাটিতে রেখে স্বাভাবিক ভাবে শরীর হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। উল্লেখনীয় যে, প্রত্যেক আসনের পর বিশ্রাম আবশ্যক। এই যোগমুদ্রা আসন কিড্‌নির পক্ষেও বিশেষ উপযোগী ও শরীর স্বচ্ছ ও সুস্থ রাখতে সহায়ক হয়।

নির্ধারিত আসন যেমন উপযোগী ততোধিক কপালভাতি, নাড়ী-শোধন এবং অগ্নিসার প্রাণায়াম ও মধুমেহ রোগের পক্ষে লাভদায়ক। তন্মধ্যে অগ্নিসার প্রাণায়ামের বিধি অনুসারে— প্রথমে পদ্মাসন অথবা সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে দুই হাত দুই হাঁটুতে স্থাপিত করে মেরুদণ্ড এবং ঘাড় সোজা রেখে নেত্রদ্বয় কোমলতাপূর্বক বন্ধ অবস্থায় প্রস্তুতি নিতে হবে। তৎপশ্চাৎ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তৎকাল তাহা নিষ্কাসনে পেট খালি করে থুতনি বুকে স্থাপিত করে মূলবন্ধ (গুহ্যদ্বার সংকুচন) লাগাতে হবে। তৎপশ্চাত শ্বাসশূন্য উদরে নাভিমূলকে ক্রমশ মেরুদণ্ডে এবং পেটকে আগে পিছে করতে হবে। সাধ্যানুসারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে হবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠাপূর্বক কিছু সময় প্রাত্যহিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত করলে মধুমেহ রোগ থেকে অনায়াসে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ সঠিক মুদ্রায় ওঠা, বসা এবং চলাফেরা আবশ্যক। কোনোপ্রকার উত্তেজনা থেকে নিজেকে সংযত রেখে সর্বদা প্রসন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। খাদ্য-খাবারে কম তেল, ঘি, মসলা এবং নিয়ন্ত্রিত আহার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে তৃপ্ত হওয়া অভ্যাসে পরিণত করলে অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হবে। তখন যে কারও সঙ্গে সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে সগর্বে বলা যেতে পারে যে— 'খুব ভাল আছি'।

(লেখক একজন যোগবিশেষজ্ঞ)

শিলিগুড়ি

বাঁকুড়া

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি বৈঠক

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি বৈঠক কয়েকটি ভাগে সম্পন্ন হয়। প্রথম বৈঠক গত ২৪ মে শিলিগুড়ির মাধবভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার ও শিলিগুড়ি বিভাগের এই বৈঠকে ২৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক সাধন কুমার পাল। এছাড়া শিলিগুড়ি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যপদ পাল ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৫ মে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে দিনাজপুর বিভাগ ও মালদহ বিভাগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ। এখানে ২৫ জন প্রচার প্রতিনিধি মধ্যে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ১ জুন বাঁকুড়া শহরের পাঞ্চজন্য ভবনে বীরভূম বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ ও বাঁকুড়া বিভাগের বৈঠক হয়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক অবনীভূষণ মণ্ডল ও বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক মোহন চট্টোপাধ্যায়। গত ৮ জুন হাওড়া মহানগর, হুগলী বিভাগ ও মেদিনীপুর বিভাগের বৈঠক হয় হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে। বৈঠকে ২৮ জনের মধ্যে ২০ জন প্রচার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদভাবনা প্রমুখ রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক ও সমাজ সেবা ভারতীর ডাঃ সনৎ বসুমল্লিক। হুগলী বিভাগ কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্য বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন।

সমস্ত বৈঠকেই বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতিতে স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসারের দিকটি তুলে ধরেন স্বস্তিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকেশ মণ্ডল। স্বস্তিকার বিতরণ পদ্ধতিকে কীভাবে গতি আনা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন স্বস্তিকার প্রসার-প্রচার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। শিলিগুড়ির বৈঠকে সাধন কুমার পাল ও অমরকৃষ্ণ ভদ্র, রায়গঞ্জ বৈঠকে প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ ও উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ পণ্ডিত, বাঁকুড়া বৈঠকে অবনীভূষণ মণ্ডল ও মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁতিবেড়িয়া বৈঠক রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক,ডা. সনৎ বসুমল্লিক ও হুগলী বিভাগ কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্য বিশেষ পথনির্দেশ করেন। সমস্ত বৈঠক পরিচালনা করেন জয়রাম মণ্ডল।

সংস্কার ভারতীর 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা'

গত ২০ মে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার 'রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে প্রথমে নজরুলগীতি পরিবেশন করে শাখার শিল্পীরা। পরে শাখার সভানেত্রী নজরুলের কবিতা পাঠ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতার উপর গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ইন্দ্রাণী দত্ত মনোগ্রাহী কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে স্বদেশ বন্দনা 'বন্দেমাতরম' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। গত ২৫ মে সম্পর্কিত স্থান আনন্দপুর শাখার সম্পাদক প্রদ্যোৎ মুকুটমণির সহায়তায় নবজাগরণী ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রচুর লোকের সমাগমে (রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা) খুবই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৈঠক

গত ৩১ মে ও ১ জুন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হিমাচল প্রদেশের উনার ৮ কিলোমিটার দূরে 'বাবা রুদ্রনন্দ' আশ্রমের স্কুলে। সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আশ্রমের কর্মকর্তারা করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ আন্নাজী সুরকুটে, সাধারণ সম্পাদক প্রভাকর কেলকর। অনুষ্ঠানে কৃষকদের সুবিধা অসুবিধা ও জৈবিক সারের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয় এবং তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই প্রস্তাব নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। বাংলার ৭ জন ওই বৈঠকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। দিল্লীতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের Agro Economic Research Centre-এর বৈঠক হয় কেশবপুরম নগরে। সেখানে বাংলার দু-জন প্রান্ত অধ্যক্ষ নন্দলাল কাট এবং কোষাধ্যক্ষ রঞ্জিত ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের শহীদ দিবসের শতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১০ মে শনিবার সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার 'গীতামন্দির সভাগৃহে' বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির দিনটি 'শততম শহীদ দিবস' রূপে বহু বিশিষ্ট গুণীজনের উপস্থিতিতে পালিত হলো। 'সর্বভারতীয় শহীদ স্মারক সমিতি', 'অশোক নাথ গৌরীনাথ স্মারক সমিতি', 'গীতা সোসাইটি অফ্ ক্যালকাটা' এবং 'সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিটিউট'— নামের চারটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্যন্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন, বিচারপতি অজিতকুমার নায়ক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃত নাট্যকার ও বলিষ্ঠ বাগ্মী অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ, সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ অ্যাডভোকেট ভূপেন্দ্র কুমার দে এবং বসন্ত বিশ্বাসের জীবনীকার ডঃ শিশুতোষ সামন্ত ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ভাগিনেয় ডাঃ রঞ্জিত বিশ্বাস। অমর বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের জীবনী অবলম্বনে অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ বিরচিত ও নির্দেশিত সংস্কৃত নাটক 'বসন্তোদয়ম্' অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল। শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষের পরিচালনায় গীতামন্দিরের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিমান ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের নাতি তরুণ বিশ্বাস অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে বসন্ত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে কীভাবে ফাঁসিকাঠে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, বিভিন্ন বক্তা বিস্তৃতভাবে সেই তথ্য তুলে ধরেন। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করার চক্রান্ত রোধ করতে লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বিপ্লবগুরু রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে বসন্তের বোমা নিক্ষেপের ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ করে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

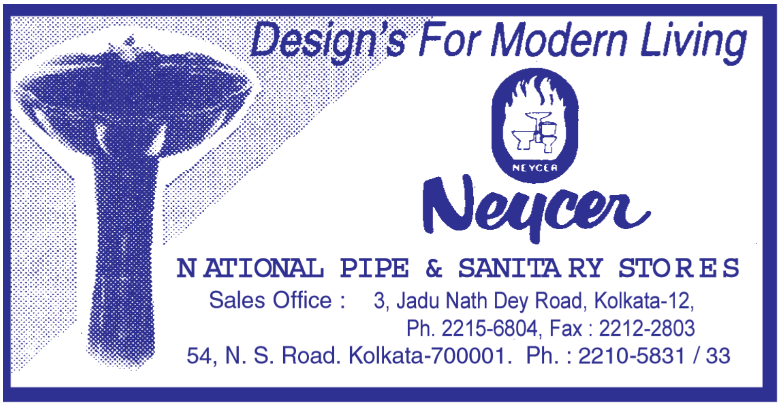

সমাবেশ সমাচার

পরলোকে রাকেশ কুমার

সীমা জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক রাকেশ কুমার গত ১২ জুন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাপ্ত সূত্রে অনুসারে, জয়সলমীর থেকে যোধপুর যাওয়ার পথে গাড়ি উলটে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই রাকেশজী ও সীমা জনকল্যাণ

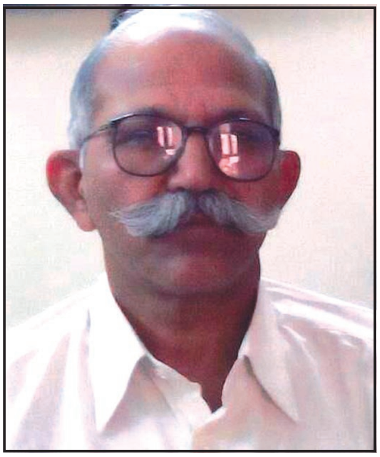

মঞ্চের জয়সলমীরের সংগঠন সম্পাদক ভীক সিংহ প্রাণ হারান। উল্লেখ, রাকেশজী সীমাজাগরণ মঞ্চের দায়িত্বের আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন।

শোকসংবাদ

গত ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, বুধবার বীরভূম জেলার বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা কোষাধ্যক্ষ, জেলার ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্য ও শ্রদ্ধার পরিচালন সমিতির সদস্য সুব্রত সিনহার পিতৃদেব বলেন্দ্রনাথ সিনহা সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগপূর্বক সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা-সহ দু' জন নাতি রেখে গেছেন।

মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী

গত ৩১ মে রাজস্থান পরিষদ ও রাজস্থান পত্রিকার যুগ্ম পরিচালনায় বিদ্যামন্দির সভাগারে স্বাধীনতার পূজারি মহারাণা প্রতাপ সিংহের ৪৭৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সমাজসেবী ও বিশিষ্ট চিন্তক জুগলকিশোর জৈথলিয়া বলেন, আমরা দেশের গৌরবময় ইতিহাস ভুলতে বসেছি, এরূপ মহাপুরুষের স্মরণ দেশবাসীকে নবশক্তিতে বলীয়ান করবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সীতারাম শর্মা। রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ শার্দুল সিংহ জৈন স্বাগত ভাষণ দেন। সমাজসেবী রতনশাহ, ভানীরাম সুরেকা, রুগলাল সুরাণা জৈন, হরিনারায়ণ রাঠী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের বক্তব্যে মহারাণা প্রতাপের শৌর্যবীর্যের কাহিনী তুলে ধরেন। শেষে বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজীব হর্ষের নির্দেশনায় নৃত্যনাটিকা 'প্রতাপী প্রতাপ' মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হুগলীর চুঁচুড়ায় সংস্কৃত শিবির

সংস্কৃতভারতীর হুগলী জেলা শাখা আয়োজিত গত ১৬-২৫ মে প্রতিদিন বিকাল ৪-৬টা চুঁচুড়াস্থিত পেয়ারাবাগান 'শ্রীশ্রী মা সারদা ভবন'-এ দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন যাদের অধিকাংশই মহিলা। শিক্ষক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য পাঠদান করেন। শিবিরের সমাপন কার্যক্রম ২৫ মে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী রমলা রায় এবং সংস্কৃত ভারতী'র দক্ষিণবঙ্গের সহ-সম্পাদক স্বপন বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে সমাপণ কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। 'শ্রীশ্রী মা সারদা ভবনে'র-সম্পাদিকা সুমনা চৌধুরী ভবিষ্যতে এই ধরনের শিবির এবং সাপ্তাহিক মিলনের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। এই শিবির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর হুগলী জেলার সংযোজক সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গম

বৃটিশ আমলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাজেয়াপ্ত নাটক মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’

প্রতিবেদক॥ সংস্কার ভারতীর সাম্প্রতিক নাটক মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’-এর প্রথম অভিনয় হয়ে গেল গত ১৪ জুন তপন থিয়েটার। পৌরাণিক এই নাটকে নাট্যকার কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, যাদব কুলপতি শূরসেনের পুত্র বসুদেবের সঙ্গে ভোজরাজ উগ্রসেনের পুত্র কংসের সংঘাত এবং অত্যাচারী কংস-এর যাদবদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিবাদে বসুদেবের নিরস্ত্র আন্দোলনের এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দর্শক সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। দর্শকেরা পৌরাণিক এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা মেলাতে পেরেছেন এবং অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকদের ওপর উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হয়ে দেশপ্রেমের আবেগে মথিত হয়েছেন। স্বভাবতই ১৯৩০-এ লেখা এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৪ জুন, ১৯৩০। অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বৃটিশ শাসক রাজদ্রোহিতার অপরাধে নাটকটি বাজেয়াপ্ত করে। মন্মথ রায় নিজে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর নাটকে স্বভাবতই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাসমূহ চিত্রিত হোত।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবজাগ্রত বাঙালি মানসে নানান চিন্তা ভাবনার উন্মেষ তার কর্মে, আচরণে ও কথায় প্রকাশ পেতে থাকে। এই ভাবনার জাগৃতিতেই স্বাদেশিকতার প্রেরণা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বাঙালিকে ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে এই চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অত্যাচারী বৃটিশ সরকারও চুপ করে বসে থাকে না। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কণ্ঠরোধ করবার জন্য এদেশে ‘ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট ১৮৭৬’ অর্থাৎ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয় এবং অচিরে গিরিশ চন্দ্রের সিরাজদৌল্লা, শিবাজী, ক্ষীরোদ প্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ, নন্দকুমার, অমৃতলাল বসুর নাট্যরূপে শরৎচন্দ্রের পথের দাবি প্রভৃতি অজস্র নাটকের সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ রায়ের এই কারাগার নাটকটির

‘কারাগার’ নাটকের একটি দৃশ্য।

অভিনয়ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটও যদি এই নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শকদের মনে উঁকি দেয়, তবে তা অস্বাভাবিক হবে না। নাটকের প্রধান চরিত্র বসুদেব যখন বলে, সংসারে আজ আচার নেই, আছে শুধু অত্যাচার; প্রীতি নেই, আছে শুধু দ্বেষ; প্রেম নেই, আছে শুধু হিংসা। ধরণী রক্তাক্ত। ধর্ম লুপ্ত। এখনো কি ঘুমিয়েই রইবে? অথবা অত্যাচারিত গ্রাম্য বালিকা চন্দনার কণ্ঠে যখন শুনি, 'সমাজ? সমাজ? কেমন সেই সমাজ— যে সমাজ তার কুলনারীকে রাক্ষসের গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে না? ...হ্যাঁ প্রায়শ্চিত্ত করব, ধর্ষিতা হয়েছি বলে নয়, মনুষ্যত্বহীন এই পঙ্কিল সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি বলে— 'এমন অজস্র সংলাপ যখন নাটক দেখতে দেখতে কানে আসে তখন চমকে উঠতে হয়। এ নাটক ১৯৩০-এ লেখা? তবে এর সংলাপ আজও কেন এত প্রাসঙ্গিক?

'কারাগার' নাটকটির অভিনয় মূল নাটককে হুবহু এক রেখে অভিনীত হয়নি। সংস্কার ভারতী তার বিজ্ঞাপনে লিখেছে 'নব কলেবরে, নতুন ভাবে'। সেটা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে সেই বিতর্কে এখন যাচ্ছি না। দর্শকেরা তার বিচার করবেন। সম্পাদনা, সামগ্রিক ভাবনা ও নির্দেশনায় রাকেশ ঘোষ বেশ কিছু নতুন ভাবনা রেখেছেন। সংস্কার ভারতী বরাবরই তার সদস্যদের দিয়েই নাটক মঞ্চস্থ করে। এদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব আছে। তবু এইসব অপটু অভিনেতাদের নিয়ে এমন একটি ধ্রুপদী নাটক মঞ্চে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অবশ্যই বাহবা পাবেন নির্দেশক রাকেশ ঘোষ। মঞ্চ নির্মাণে মণীন্দ্র বেরা, আলোক পরিকল্পনা ও প্রক্ষেপণে বাবলু সরকার ছিলেন। বাবলু সরকার বেশ কিছু নাট্যমুহূর্ত আলোক সম্পাতের মাধ্যমে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সঙ্গীত (অভীক চক্রবর্তী) এক কথায় অনবদ্য। 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি'..., নারায়ণ স্তব, ঘণ্টাধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নাটকটির এক প্রার্থিত পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। পোশাক পরিকল্পনার ব্যাপারে নির্দেশককে দু-একটি কথা ভাবার অনুরোধ করবো। সেনানায়ক বিদূরথ যেখানে আগাগোড়া সৈনিকের পোশাকে ছিলেন সেখানে আর এক সৈনিক আগাগোড়া উন্মুক্ত বক্ষে অভিনয় করে গেলেন। যাদব পল্লীতে আগুন লাগার দৃশ্যে লাল আলোর ব্যবহার যথাযথ। কিন্তু অন্য অনেক দৃশ্যে অযথা লাল আলোর ব্যবহার চোখে লাগে। বিশেষ করে নাটকটি যখন অভিনয় করছে একটি গ্রুপ থিয়েটার।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় কংসের ভূমিকায় অভিনেতা অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়ের। কংসকে রূপ দিতে তিনি বেশ পরিশ্রম করেছেন। অভিনয় একটু উচ্চ গ্রামের হয়েছে— অবশ্য চরিত্র ও সংলাপ তা দাবি করে। বসুদেব ও দেবকীর চরিত্রে রাকেশ ঘোষ ও সুপ্রীতি ভদ্র অপূর্ব। অবাক করেছেন চন্দনার ভূমিকায় সুব্রতা হালদার। তাঁর চরিত্রের দ্বৈতরূপ ফোটানোর তিনি চেষ্টা করেছেন। অনেকটা উতরে গেছেন বলা যায়। নাটকের রোমান্টিক চরিত্র কঙ্কা ও কঙ্কণের ভূমিকায় জাহ্নবী মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ সাহা বেশ ভালো। দুটি মাত্র দৃশ্যে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিতি পুত্র কংসের দাপটে অসহায় পিতা উগ্রসেনের। বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর ভূমিকায় ভালোই। নরকের চরিত্রে পাঁচু গোপাল দে ও বিদূরথের চরিত্রে সুকুমার পতির আরও কিছু দেওয়ার আছে।

এছাড়া বিদ্যুৎ সরকার, বিভাস নস্কর, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, দেবাশিস চৌধুরী সুন্দর অভিনয় করেছেন। অবাক করেছেন সবিতা দে। স্বামীর দাপটে অসহায় অথচ পুত্রের মঙ্গল কামনায় দৃঢ় এক চরিত্রে তিনি সুন্দর অভিনয় করেছেন। পরিশেষে, এমন একটি ধ্রুপদী নাটক বেছে নেওয়ার জন্য সংস্কার ভারতীকে ধন্যবাদ জানাই।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com, web : www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

শব্দরূপ-৭১২ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

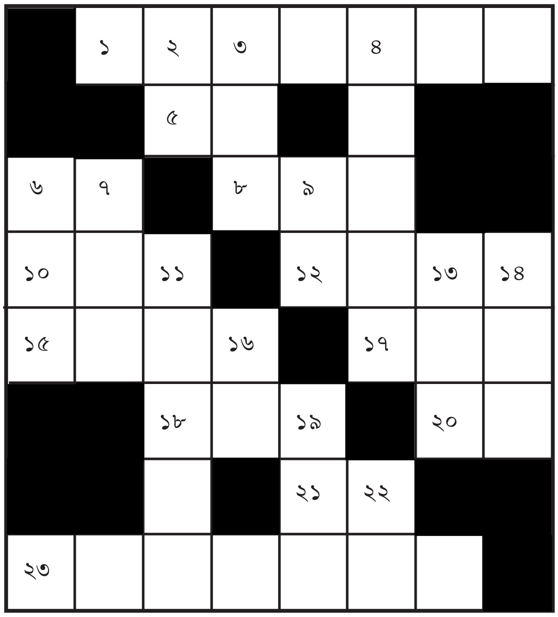

সূত্র :

পাশাপাশি : **১**. 'অ্যালবার্ট হল' বর্তমান যে নামে, **৫**. অনিত্য, বিনাশশীল, **৬**. চেয়ে অস্বীকার করা, ঋণ, **৮**. অখাদ্য, **১০**. মর্মগ্রাহী ব্যক্তি, **১২**. রাজরোগ, **১৫**. লালপদ্ম, **১৭**. 'চোখে—কম হলে আর', **১৮**. কবির কাজ, **২০**. কাগজের হিসাব, **২১**. জাঁকজমক, **২৩**. নাগরিকদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ, বন্টন ও সংরক্ষণের সরকারি দপ্তর।

উপর-নীচ : **২**. শিশুরোগ, **৩**. পাচক, **৪**. উৎক্ষেপণ, **৬**. কাঠের পিলসুজ, **৭**. মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ উৎপাদক স্থান, **৯**. শিবের শ্বশুর, **১১**. বিষাক্ত ধাতব পদার্থ, হরিতাল, **১৩**. ভারতীয় পল্লীসংগীত, **১৪**. সংকোচ; 'লজ্জা—ইমান ধরম্' (হেমন্ত মুখোঃ) **১৬**. গর্তে প্রবাহ, **১৯**. ভ্রমর, দ্বিরেফ, **২২**. ক্ষমা, তিতিক্ষা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৯
সঠিক উত্তরদাতা
সুব্রত মাহাতো
ঝালদা, পুরুলিয়া
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		ফ	লা	হা	র		জ
হা	ভা	তে			সি		বা
	ট		শ		ক	ম	লা
	চা	বা	ক			গু	
	লা			বা	ম	ন	
উ	কি	ল		মা		মি	
ও		ব			আ	শ্র	ম
রা		জ	ল	পা	ই		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■ ৭১২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ জুলাই, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

কোচবিহার		
নাম	**স্থান**	**ফোন নং**
নিগমানন্দ রায় সরকার	সিতাইহাট	৯০০২৮১৬৪১৩
সমিতা ভৌমিক	মাথাভাঙা	৮৯০০৪৩২৪০৫
কামিনী বর্মন	জামালদহ	৯০০২৭০৭১১১
তুলসীরঞ্জন সরকার	মেখলিগঞ্জ	৯৫৩১৬২৩০৫১
গিরীন্দ্রনাথ বর্মন	শীতলকুচি	৯৮০০৫৩৩৯৬৫
প্লাবন দে সরকার	কোচবিহার বিবেকানন্দ রোড	৯৪৭৪৯৬৪৬৯১
লক্ষ্মণ রায়	পুণ্ডিবাড়ি	৮০১৬৭৭০৮০৮
কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী	দিনহাটা	৯০৯৩৬৭০৬৯২
প্রতুল চন্দ্র সাহা	তুফানগঞ্জ	৯৯৩৩৮৭৯১১৭
	জলপাইগুড়ি	
কমল দত্ত	মালবাজার	৯৮০০৩১৮৭১৬
দেবাশিস বসুভাট	ময়নাগুড়ি	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
চন্দন রায়	জলপাইগুড়ি, কদমতলা	৯৯৩৩৭৭৩৯১৩
গৌরাঙ্গ রায়	হলদিবাড়ি	৯৮০০৬৮৮৯৮৬
সুনীল কুমার ধর	আলিপুরদুয়ার	৯৮৫১৮৬৭৪৯৪
অজিত ঘোষ	আলিপুরদুয়ার বাবুরহাট	৯৭৭৫৮৭৩২১১
	শিলিগুড়ি	
মনোরঞ্জন মণ্ডল	শিলিগুলি জংশন	৯১২৬৮৪৩৭১৬
অধ্যাপক সত্যপদ পাল	শিবমন্দির, শিলিগুড়ি	৯৪৭৫৩৯৩৭৯৭
সুজিত দাস	নকশালবাড়ি	৯৮০০৮৬৭৯৯০
সুবোধ পাল	ভারতনগর, শিলিগুড়ি	৯৪৭৬৩৯০৯৪০
তন্দ্রা সরকার	ফুলেশ্বর, শিলিগুড়ি	৯৮৩২৫৫৫২১৭
সুধীর ঘোষ	রথখোলা, শিলিগুড়ি	৯৬৪১৩৫০৮৫৭
অঙ্কুর সাহা	বলাইদাস চ্যাটার্জী রোড, হাকিমপাড়া	৯৭৭৫৯৩৪৫৭০

	শিলিগুড়ি	
নাম	**স্থান**	**ফোন নং**
কমল ঘোষ	ঘোগোমালি	৯৬৪১৭৩৩৬৬৬
দীপক মহন্ত	ভক্তিনগর,	৯৬৪১৭৪৬৭৫৫
সঞ্জীব পাল	রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি	৯৬৪১৩৪৮৮৮১
জগবন্ধু রায়	মাটিগাড়া	৯৫৪৭৪৫২৬৯৬ ৮৫০৯৫১৬১০৫
	উত্তর দিনাজপুর	
ধীরেশ দেবশর্মা	বিবেকানন্দ ভবন, রায়গঞ্জ	৭৬৭৯৭৩০৫৮৮
ভূদেব পাল	ইসলামপুর	৯৮৩২৩৩৪১৪৮
সত্যসুন্দর সাহা	কালিয়াগঞ্জ	৯৯৩২৫৯২৬৬৫
	দক্ষিণ দিনাজপুর	
অরুণ কুমার মণ্ডল	কুমারগঞ্জ	৮০১৬১৩৭১৪৮
অধীর কুমার দাস	গঙ্গারামপুর	৭৭৯৭৯০৮৬১৩ ৯৪৭৫৬৭৬৭৫৬
বভ্রূবাহন মণ্ডল	দৌলতপুর	৮২৯৩৪১৪৪৬৩
বলরাম দাস	গঙ্গারামপুর	৯৯৩৩১৪৫৮২৫
পিন্টু দাস (উদয়)	বালুরঘাট, বেলতলাপার্ক	৯৪৭৪৪৩৫৩১০
	মালদহ	
পরেশচন্দ্র সরকার	গাজোল	৯৬০৯৯২৭১০৬
ধনঞ্জয় ঠাকুর	কালিয়াচক	৯৭৩৫৯৩৬২৮৮
নির্মল কুমার নাথ	নালাগোলা	৯৪৭৪৪৭১৪৩৭
স্বপন কুমার সাহা	নাগেশ্বরপুর	৯৫৯৩৬০০৯৭৮
ডাঃ পরিমল দাস	বীরনগর, কালিয়াচক	৮৯২৭৪৪৭২১০
মন্টু সরকার	ধূমাদীঘি	৮৬৭০৪০০৬৫৪
রথীন্দ্রনাথ সরকার	বিদ্যাসাগর পল্লী	৯৪৭৪১৬৩৯৪১
গোপাল বসাক	দক্ষিণ সিঙ্গাতলা	৯০০২৯৭০৪২৪
তরুণ কুমার পণ্ডিত	কাঞ্চনতার	৮৭৫৯০৬৯১১১
নীলকমল সরকার	কাটিকান্দর, গাজোল	৮৩৪৮৫৫০২২৭
বীথিকা দাস	সামসী	৯৬৪৭৭০৯০৪৮
জয়শঙ্কর দাস	কলিগ্রাম	৮৭৫৯৯৯৪৭৬৬

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
23 June - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা